কেদার রায়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

ঢাকা।
নবাবপুর আলবার্ট লাইব্রেরী হইতে
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩২১ সাল।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।
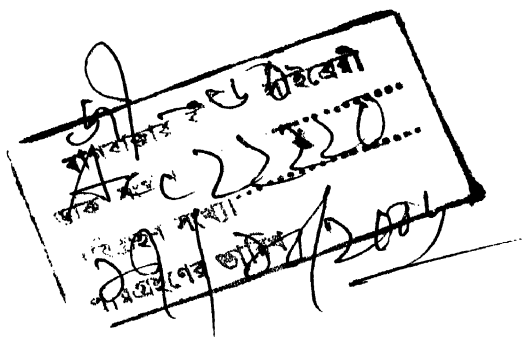
উৎসর্গ

প্রিয়তম সুহৃদ,

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ,

করকমলেষু।

ভাই যোগীন্,

কেদার রায় তোমার করকমলে অর্পণ করিলাম। অন্যের নিকট অনাদৃত এবং উপেক্ষিত হইলেও তুমি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ-বীর কেদার রায়ের জীবন-ইতিহাস প্রীতির চক্ষে দেখিবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। আর এক কথা—সে কথাই সর্ব্বোপরি। তোমারও আমার বন্ধুত্ব-স্মৃতি যাহাতে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের হৃদয়েও জীবিত থাকে সে মহা উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই তোমার গৌরবময় নামের সহিত কেদার রায়ের সংযোগ করিলাম।

তোমার মিত্র।

সূচী।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

আলোচনা—বংশ-পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঈশাখাঁ—সোণাবিবি।

তৃতীয় অধ্যায়।

সনদ্বীপের যুদ্ধ।

চতুর্থ অধ্যায়।

বাঙ্গালী ও মোগলে ভীষণ যুদ্ধ।

পঞ্চম অধ্যায়।

কীর্ত্তি-কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গুরু পুরোহিত ও বিবিধ কিংবদন্তী।

সপ্তম অধ্যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে বিক্রমপুর।

অষ্টম অধ্যায়।

পরিশিষ্ট—আলোচনা।

কেদার রায়।

উপক্রমণিকা।

বারভূঁইয়ার ইতিহাস।

যে বীরশ্রেষ্ঠ কেদাররায়ের জীবনেতিহাস আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি বারভূঁইয়ার অন্যতম ভূঁইয়া ছিলেন, কাজেই প্রথমে পাঠকবর্গকে বারভূঁইয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের সহিত পরিচিত করিয়া লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

বারভূঁইয়ার কথা।

বারভূঁইয়ার কথা অনেক দিন হইতেই বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত, কেবল যে বাঙ্গালাদেশেই বারভূঁইয়ার উল্লেখ আছে তাহা নহে। প্রকৃতির লীলা-নিকেতন গিরি-বন-নদীবেষ্টিত আসাম প্রদেশেও এই বারভূঁইয়ার কীর্ত্তি-কাহিনী প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরা এবং আরাকানের অধিপতিগণও আপনাদিগকে বারভূঁইয়ার অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিতেন।*

* The Kings of Aracan and Comilla were constantly striving for the mastery, and the former even conquered the greatest part of the Bengal. Hence to this day they assume the title of Lord of the Twelve Bhuoiyans, bhaties, or principalities of Bengal. Wilford. Ancient Geography of India, VOL. XIV. of Asiatic Researches Page 457.

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও বারভূঁইয়ার বা দ্বাদশ মণ্ডলের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনু-সংহিতায় দ্বাদশ জন মণ্ডলের উল্লেখ আছে। মনু লিখিয়াছেন ;—

"মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ
বিজিগীষোশ্চচেষ্টিতং।
উদাসীন প্রচারঞ্চ
শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ॥
এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং
মণ্ডলস্য সমাসতঃ।
অষ্টৌ চান্যাঃযসাখ্যাতা
দ্বাদশৈবতুতাঃ স্মৃতা॥"*

অর্থাৎ প্রাচীনকালে বিজিগীষু নৃপতি তাঁহার শত্রু এবং পরস্পরের মধ্যে ও সমীপবর্ত্তী রাজাদিগকে লইয়া একটী মণ্ডল গঠিত হইত, সেই মণ্ডলে দ্বাদশ জন নরপতি থাকিতেন। ক্রমে কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ নিয়োগের পরিবর্ত্তে এক একজন নৃপতির অধীন দ্বাদশজন সামন্ত নিয়োগের রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও এই রীতির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বীরপ্রসূ রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানেও তাহাই দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালা দেশে অনেক দিন হইতেই বারভূঁইয়া সম্পর্কিত নানাবিধ প্রবাদ বাক্য

The Raja of Kachhar conferred the titles of Bara Bhuya, Madhya Bhuya and Chotta Bhuya on any petty land-holder (Mirasdar) who paid him a fee of fifty rupees.

J. R. A. S. On the Barah Bhuyas of Eastern Bengal by J. Wise, Page 198.

* মনুসংহিতা ; ৭ম অধ্যায়।

সুপ্রচলিত। এই বারভূঁইয়ার অন্তর্গত ভৌমিক নৃপতিগণ কে কে ছিলেন এবং কেই বা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল সে প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য এ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে আলোচিত হয় নাই।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও বারভূঁইয়ার উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কনের চণ্ডী (১) ও মাণিক গাঙ্গুলির 'ধর্ম্ম-মঙ্গল' গ্রন্থেও বারভূঁইয়ার (২) উৎপত্তি সম্পর্কিত একটী জন-প্রবাদের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন "On a certain occasion twelve persons of very high distinction and mostly of the Pal family came from the west country to perform a religious ceremony on the Korotya river (the boundary between the ancient divisions of Matsya and Kamrup) but arrived too late, and as the next season for performing the ceremony was twelve years distant, they in the interval took up their abode there, built palaces and temples, dug tanks, and performed many other great works. They are said to have belonged to the tribe called Bhuyas to which the Rajahs of Kasi and Bhettiah also belong." অর্থাৎ কোন এক সময়ে দ্বাদশ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (অধিকাংশই আবার পালবংশীয়) ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য পশ্চিম প্রদেশ হইতে করতোয়া নদীরতীরে, যে স্থানে প্রাচীন মৎস্য ও কামরূপ প্রদেশের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তথায় উপস্থিত হ'ন। কিন্তু তাঁহাদের পঁহুছিতে বিলম্ব হওয়ায় অনুষ্ঠানের

(১) অভিষেক করাইল বসাইল খাটে।
আজি হইতে কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥
নিজ হস্তে নরপতি টীপ দিলা ভালে।
যতভূঞা মিলিয়া খাটায় তার তলে ॥

(২) বারভূঞা বসে আছে বুকে দিয়া ঢাল।

নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়াই পুনরনুষ্ঠানের জন্য কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। এই অবসর সময়ে তাঁহারা উক্ত প্রদেশে প্রাসাদ, দেবমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং বহু জলাশয়াদি খনন করিয়া অবস্থান করেন। কথিত আছে যে, তাঁহারা ভূঁইয়া নামক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; কাশী-নরেশ ও বেতিয়া রাজ এই বংশান্তর্গত। এই দ্বাদশজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই 'বারভূঁইয়ার' নামোৎপত্তি হওয়া অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না। ডাঃ টেইলার তৎ প্রণীত Topography of Dacca নামক গ্রন্থেও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।* শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় বলেন 'বারভূঁইয়া যে কেবল বারজন ভূম্যধিকারীর সমষ্টি ছিল তাহা নয়; বহুলোকে একত্র হইয়া কার্য্য করিলে যেমন তাহাকে পঞ্চায়তের কার্য্য বা বারইয়ারী কার্য্য বলে, উহাও তদ্রূপ ছিল। বিশেষ এইরূপ আধিপত্যশালীর উপর যিনি প্রাধান্য লাভ করিতেন, তিনিই নৃপতি বা সম্রাট্ নামের যোগ্য হইতেন।' †

ভূঁইয়াগণের জাতি নির্ণয়।

বারভূঁইয়াগণের জাতি-নির্ণয় সম্বন্ধে বহু মতভেদ লক্ষিত হয়। বুকানন (Buchanan Hamilton) হ্যামিল্টনের মতে তাঁহারা বর্ত্তমান ভূমিহারগণের সমশ্রেণী ছিলেন, আর ডাল্টনের মতে তাঁহারা ওড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের ভূঁইয়াগণের সমজাতি। এ জাতিতত্ত্বের আলোচনার শক্তি আমাদের নাই। তবে ভূঁইয়া শব্দের খাঁটি অর্থ কি তাহা আলোচনা করিতে গেলে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মিঃ শোরের মতানুসারে বলিতে হয়

---

* Topography of Dacca.

† বারভূঞা শীর্ষক প্রবন্ধ, জাহ্নবী, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩১৫।

'Bhumik and zemindar are the same.' * ভূঁইয়া যে সম্ভ্রম সূচক উপাধি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ অদ্যাপি বিক্রমপুর অঞ্চলে ভূঁইয়া শব্দের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমি-বিহীন প্রভুকেও ভৃত্যেরা ভূঁইয়া নামে অভিহিত করে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, সকলেই ভূঁইয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন 'বাবু' নামক সাধারণ উপাধিটি বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী মাত্রেরই নামের সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে, তেমনি এককালে 'ভূঁইয়া' এই সাধারণ উপাধিটা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেরই নামের সহিত সংযোজিত হইত। ভূঁইয়া-ভৌমিক শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়। ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব বলেন যে, দিল্লীর সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক যে সকল উপাধি প্রদত্ত হইত তাহার অধিকাংশই আরবী কিংবা পারসী ভাষার অন্তর্গত, কদাচিৎ সংস্কৃত, অতএব তাঁহার মতে এই উপাধিটি গৌড় কিংবা নবদ্বীপের হিন্দু অধীশ্বরগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এইরূপ অনুমানই সুসঙ্গত। † মহাত্মা আক্‌বরের রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের ভূম্যধিকারিগণের অবস্থা কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধে কোনও সঠিক বৃত্তান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ নাই বলিয়াই ভৌমিক শব্দের প্রকৃত মূলতত্ত্ব লইয়া এত গোলযোগ। ইতিহাসের প্রমাণ দূরে রহিলে জন-প্রবাদ মাথাতুলিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ পায় বলিয়াই বারভূঁইয়ার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নানাবিধ গোলযোগ দৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত

---

* Analysis of the Laws and Regulations by J. B. Harrington. Vol. IIIP. 240.

† The titles bestowed by the Delhi Kings were mostly Arabick or Persian, rarely Sanskrit. It is probable, therefore, that Bhowmick was conferred by the Hindu Princess of Gour, or Nadiya. J.R.A.S. 1874. P. 198.

নিখিল বাবুর মতে পাল—রাজগণের রাজত্ব কালে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। *

নিখিল বাবুর এইরূপ মন্তব্য প্রকাশের প্রধান যুক্তি এই যে, "যে সময়-কার সাহিত্যে ও অন্যান্য গ্রন্থাদিতে ভূঁইয়া শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় সে সময়ে পাল রাজগণ বাঙ্গালা দেশের অধিপতি। তাঁহারা সমগ্র বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর থাকায় সম্ভবতঃ ভূঁইয়াগণ তাঁহাদের অধীন সামন্ত রাজ-রূপেই গণ্য হইতেন। ধর্ম্মমঙ্গলাদি গ্রন্থে পাল রাজগণের সঙ্গে বারভূঁইয়াগণের উল্লেখ দেখা যায়। ধর্ম্মমঙ্গলে রাজসভা বর্ণনোপলক্ষে বারভূঁইয়ারও বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বিবাহাদি উৎসবে বারভূঁইয়ারা বরমাল্য প্রভৃতি দান করিতেন। মাণিক গাঙ্গুলি কামরূপাধিপতিকে গৌড়েশ্বরের বারভূঁইয়ার অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বারভূঁইয়াগণ সামন্ত রাজাই ছিলেন।"

ঢাকা জেলার কুহেলিকাচ্ছন্ন অতীত ইতিহাসের কিংবদন্তী আলোচনার পর টেইলার সাহেব তৎপ্রণীত Topography of Dacca নামক গ্রন্থে ভূঁইয়া রাজাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"The next rulers we hear of belonged to the Boonehas or Buddhist Rajas. * * * * Three of the Booneah Rajahs took up their abode in this district, and in that portion of it lying to the north of the Booriganga and Dulleswary, where the sites of their capitals are still to be seen. Jash Pal resided at Moodabpore in the purganah of Toolipabad, Haris Chandra at Catebury near Saber, and Jessoopal at Kapassia in Bhowal."

* শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল প্রণীত 'প্রতাপাদিত্য' ৪৩—৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এ সকল শাসনকর্ত্তারা যে ভূঁইয়া নামে অভিহিত হইতেন এবং পাল বংশোদ্ভব ছিলেন তাহা টেইলার সাহেবের লিখিত এ বিবরণী হইতে এবং হাণ্টার সাহেবের "Stastistical Account of Dacca" নামক গ্রন্থ হইতে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। হাণ্টার লিখিয়াছেন—"The Bhuya or Buddhist Rajas (Founders of the Pal dynasty of the kings of Bengal) are the next rulers spoken of." *

ঢাকা জেলায় অদ্যাপি তিনজন ভূঁইয়ার বিবিধ কীর্ত্তি জীবিত রহিয়া তাঁহাদের অস্তিত্বের প্রামাণিক সত্য জ্ঞাপন করিতেছে। কাপাসিয়া নামক স্থানে অদ্যাপি ভূঁইয়ারাজগণের কাছারী বাড়ীর স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব নানাদিক্ হইতে যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে পালবংশোদ্ভব ব্যক্তিরাই যে প্রথমে ভূঁইয়া নামে পরিচিত হইয়াছিলেন তাহাই যুক্তিযুক্ত।

পাঠান ও মোগল রাজত্বকাল।

পাল ও সেনবংশীয়দিগের ক্রমিক অধঃপতনের পর পাঠানেরা বাঙ্গলা দেশের অধিপতি হন। পাঠানদের শাসন সময়ে বারভূঁইয়ার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার বিশেষ কোন বিবরণ জানিতে পারা যায় না। আমরা এইমাত্র জানিতে পারি যে, প্রায় ১৫৪১ খ্রীঃ অঃ সেরসাহ বঙ্গদেশকে কতকগুলি শাসনকর্ত্তা বা কাজীর মধ্যে বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহারা পরস্পরে স্বাধীন ভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিত; আবার এ সকল কর্ম্মচারিগণের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। ইস্লাম সাহের রাজত্বকালে সের সাহের প্রবর্ত্তিত এ সমুদয় রীতি-নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়

* Hunter's Statistical Account of Dacca, P. 118.

যে, পাঠান শাসনকালে বারভূঁইয়ার অধিকাংশই মুসলমান ছিলেন এবং ইঁহারা অপর কয়েক জন হিন্দু ভূঁইয়ার সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্থানে স্থানে বারভূঁইয়ার সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে অনুমিত হয় যে, ইঁহারা পরস্পর স্বাধীন ভাবে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহাদের পদমর্য্যাদা বংশপরম্পরানুগত ছিল; অপর পক্ষে, নামে মাত্র অধীন হইলেও সম্পূর্ণভাবেই তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের নিকট বার্ষিক রাজস্ব দেওয়া ব্যতীত রাজ-দরবারে তাহাদের অপর কোনও সম্পর্ক থাকিত না। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকারবিস্তৃতি ছিল। প্রকৃত পক্ষে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ভুলুয়া, যশোহর, বাখরগঞ্জ এবং ফরিদপুর এই কয় জেলায় তাহাদের অধিকার বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের কোন অংশে বারভূঁইয়ার অধিকার বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওয়াইজ (Dr Wise) সাহেব বলেন, এই সকল ভৌমিকেরা সেকালের জায়গীরদার বা চাকলাদারের সমকক্ষ হইলেও প্রাচীন যুগের ভূম্যধিকারীগণের সহিত ইঁহাদের তুলনা করিলেই অধিকতর সুসঙ্গত হয়। ভূঁইয়াদের অধীনে চৌধুরীরা কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীগণের গ্রন্থেও ভৌমিকদের বিষয় উল্লিখিত আছে। ১৫৮৬ খৃঃ অঃ রাল্‌ফ ফিচ্ যখন শ্রীপুর আগমন করেন তখন তিনি চাঁদরায় কেদাররায় এই দুই ভ্রাতাকে বিক্রমপুরাধিপতিরূপে দেখিয়াছিলেন। ইঁহারা সম্রাট্ আক্‌বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কেদাররায় বারভূঁইয়ার অন্তর্গত একজন ভূঁইয়া ছিলেন। নিকলাস পিমেণ্টা (Nicholas Pimenta) তাঁহার Relatio Historica de Rebus in India Orientales নামক গ্রন্থে ভৌমিকগণের বিষয় লিপিবদ্ধ

করিয়া গিয়াছেন। এই জেস্থইট্ পাদ্‌রী নয় জন ভূঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, দ্বাদশজন ভৌমিকদের মধ্যে নয়জন মুসলমান ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ডুজারিক (Piere Dujarric) প্রণীত "Histoiredes Indes Orientales" (V V Partic) নামক পুস্তকে দ্বাদশ ভৌমিকদের একটী বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ইহা হইতেই জানা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে বারভূঁইয়াগণের প্রতাপ কতদূর বিস্তৃত ছিল। ডুজারিকের গ্রন্থ পাঠেই জানিতে পারি যে ভৌমিকদের মধ্যে তিনজন হিন্দু এবং বাকী নয়জন মুসলমান ছিলেন। হিন্দুগণ শ্রীপুর, চ্যাণ্ডিকান ও বাক্‌লার অধিপতি ছিলেন। ফার্নাণ্ডেজের গ্রন্থেও বারভূঁইয়ার একটী বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

এই বারভূঁইয়াদের রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার কোনও নিশ্চিত বিবরণ জানিতে পারা যায় না। মিঃ রেইনি বিশেষ কোন প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন না করিয়াই বলিয়াছেন যে, তাহাদের রাজ্য উড়িষ্যা এবং আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। "প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" রচয়িতা রামরাম বস্থও এই মতাবলম্বী। তাঁহাদের এ উক্তির ঐতিহাসিক অনুসন্ধান যথার্থরূপ হইলে ডাক্তার বুকানন ও ডাল্টন প্রমুখ পণ্ডিতগণের লিখিত আসামের বারভূঁইয়াগণের সহিত বাঙ্গালা দেশের বারভূঁইয়াগণের কিরূপ সংশ্রব ছিল তাহা পরিস্ফুট হইয়া অনেক লুপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য নির্নীত হইতে পারে। বারভূঁইয়ার অন্তর্গত এই দ্বাদশজন ভৌমিকের নাম লইয়া বড়ই গোলযোগ আছে। ক্রমিক অনুসন্ধান দ্বারা ভূঁইয়াগণের নাম যেরূপ ভাবে নির্নীত হইতেছে তাহাতে পূর্ব্বতন লেখকগণের লিখিত মতের সহিত বহু অনৈক্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা নয়জন মুসলমান এবং তিনজন হিন্দু ভৌমিক ছিলেন এইরূপ লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের নিম্নলিখিতরূপ তালিকা হইতে ছয়জন হিন্দুর নাম পাই।

১। ফজল গাজী (ভাওয়াল)
২। ঈশাখাঁ মস্‌নদআলী (খিজিরপুর—সোণারগাঁ)
৩। চাঁদরায় কেদাররায় (বিক্রমপুর)
৪। কন্দর্প নারায়ণ (চন্দ্রদ্বীপ)
৫। লক্ষ্মণ মাণিক্য (ভুলুয়া)
৬। মুকুন্দরায় (ভূষণা)
৭। রামকৃষ্ণ (সাঁতৈল)
৮। চাঁদগাজি (চাঁদ-প্রতাপ)
৯। প্রতাপাদিত্য (যশোহর)
১০। হাম্বির মল্ল (বিষ্ণুপুর)

এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ দিনাজপুরের, পুঁঠিয়ার ও তাহেরপুরের রাজবংশীয়দিগকে ভূঁইয়া সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেন। এ বিষয়ে কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রথম অধ্যায়।

আলোচনা—বংশ-পরিচয়।

ষোড়শ শতাব্দী বাঙ্গালার গৌরবময় পুণ্য-যুগ। সে যুগে বাঙ্গালীই বাঙ্গালাদেশের অধিপতি ছিল, সমগ্র বাঙ্গালা ভূমি তাহাদেরই শাসনাধীনে ছিল। বঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশ কেদার, প্রতাপ, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণমাণিক্য, মুকুন্দরাম, সীতারাম, হাম্বীর প্রভৃতি বীরপুরুষগণের বীরত্ব-গৌরবে চির-দীপ্তিমান্ ছিল। আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাঁহাদেরই একজন প্রধান বীরপুরুষের পুণ্য-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া ধন্য হইব। তিনি আর কেহই নহেন, বিক্রমপুরের বীর, বাঙ্গালার মুকুট-মণি মহাত্মা কেদার রায়। ভারতচন্দ্রের অমর লেখনী প্রভাবে যেমন;—

'যশোর নগরেধাম, প্রতাপআদিত্য নাম মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ,'

বাঙ্গালার পল্লীতে-পল্লীতে, কুটিরে কুটিরে চির-পরিচিত, কেদার রায়ের নামের সহিত তদ্রূপ তৎকালীন কোনও কবি-প্রতিভা সম্মিলিত না হওয়ায় তাহার নাম ও কীর্ত্তি-কাহিনী অনেকের নিকট অপরিচিত। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে দেশীয় কুলাচার্য্যগণ পর্য্যন্ত তাহাদের ঘটককারিকা গ্রন্থে এই মহা-পুরুষের সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করিয়া যান নাই; কারণ তাঁহারা কুলীন ছিলেন না। কৌলীন্য-বিরহিত কত মহাপুরুষের পুণ্য-জীবন-কাহিনী যে এইরূপ ভাবে ইতিহাসের বক্ষ হইতে লুপ্ত হইতেছে, কে তাহার সন্ধান রাখে? চাঁদ রায় কেদার রায় সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানিতে পারি তাহা শুধু ইউরোপীয় পর্য্যাটকগণের

কৃপায়, এবং দেশ-প্রচলিত কিংবদন্তী সমূহ হইতে, কিন্তু আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিংবদন্তী সমূহের প্রতি যেরূপ বীতরাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে কিংবদন্তী সমূহের ক্ষীণ প্রাণ যে আর বড় বেশী দিন জীবিত রহিবে তাহাত মনে হয় না! চাঁদ রায় কেদার রায় বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা-দেশের অধিবাসী ছিলেন,—কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁহাদের সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারীগণের লিখিত বিবরণীর সাহায্যে। দেশের প্রকৃত ইতিহাস 'কুলপঞ্জী' গ্রন্থে অকুলীন চাঁদ রায় কেদার রায় সম্পর্কে কোন কথার উল্লেখ না থাকিলে ও ভস্মাবচ্ছাদিত অগ্নির তেজের ন্যায় তাঁহাদের বীরত্ব-প্রভা সুদূর অতীতের অন্ধ-তমসা ভেদ করিয়া যে অত্যুজ্জ্বল আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে, কাহার সাধ্য তাহা হীনপ্রভ করে? সত্য,—স্বার্থপর হীনচেতা মানবের সংকীর্ণ রীতির বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এ বিষয়ে আর অধিক বাদানুবাদ না করিয়া আমরা সর্ব্বাগ্রে ইঁহাদের সম্পর্কিত দেশীয় কিংবদন্তী সমূহের আলোচনা করিলাম। (১) ফুলবাড়িয়া,—স্রোতস্বিনী কীর্ত্তিনাশা তরুণা-বস্থায় যে তেত্রিশ খানা পল্লীকে উদরসাৎ করিয়া স্বীয় নামের গৌরব ও সার্থকতা সম্পাদন করেন, চাঁদ রায় ও তৎপুত্র কেদার রায় নামক বিখ্যাত ব্যক্তিদ্বয় তৎ সমুদয়ের অন্যতম গ্রাম ফুলবাড়িয়া নিবাসী ছিলেন। তাঁহারা প্রভূতপরাক্রমশালী ও বদান্যছিলেন। তাহাদের এইরূপ প্রতিপত্তি ছিল যে আজিও আশিশু সকলের মুখে ক্ষমতার পরিচয় প্রদান সময়ে তাঁহাদের নাম শ্রুত হয়।

দেশ প্রচলিত কিংবদন্তী

রায়দিগের বিভব ও অনল্প ছিল। ইঁহাদিগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী আছে। এমত কথিত আছে যে, চাঁদ রায় পিতৃব্য পুত্রগণ কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে জমিদারি লাভে এককালে বঞ্চিত হন। অনন্তর চাঁদ রায় নিজ জীবনে বীততৃষ্ণ হইয়া তাহার বিসর্জ্জন

মানস করিয়া ভগবতীর আরাধনা ও ধ্যানে প্রবৃত্ত হ'ন। দেবীর প্রতি চাঁদ রায়ের অকৃত্রিম ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। ভক্ত-বৎসলা দেবী চাঁদ রায়ের স্তুতিতে নিতান্ত প্রীতা হইয়া তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হন। স্কন্দ-জননী তাঁহার জীবন পরিত্যাগের কারণ অবগত হইয়া এই বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন—"বৎস! জীবিতাশা পরিত্যাগ করিও না। যদিও তোমাকে অত্যন্ত হীনবল দেখিতেছি কিন্তু এখন হইতে তোমার দল প্রবল হইবেই হইবে। ব্রহ্মাণ্ডগিরি তোমার ইষ্টদেবতা। যাও, তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে থাক। তোমার মনোরথ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।" এই বলিয়া জগদম্বিকা অন্তর্হিতা হইলেন। চাঁদ রায় তদবধি ইষ্টদেবতার নিকট পরামর্শ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে যে প্রজামণ্ডলীর একজন মাত্রও তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারী ছিল না, এখন তাহাদের সকলেই চাঁদ রায়ের দলস্থ ও বশীভূত হইল। মহাবল চাঁদরায় এইরূপ প্রোৎসাহিত হইয়া দায়াদবৃন্দের পরাজয় সম্পাদন করেন। অনন্তর সমস্ত জমিদারী ইহাঁর হস্তগত হয়। সূচ্যগ্র ভূমিও তাঁহার পিতৃব্য পুত্রদিগের অধিকারে ছিল না।"* দেশের কৃতি-পুরুষগণের সম্বন্ধে জন-প্রবাদ রচিত হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ আমাদের দেশের প্রত্যেক খ্যাতিমান্ বংশের পূর্ব্বপুরুষ সম্পর্কেই যখন বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন চাঁদরায় কেদার রায়ের ন্যায় খ্যাতিমান্ বীর ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে নানাবিধ কিংবদন্তী রচিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

(২) ময়মনসিংহ সুসঙ্গের রাজবংশ পূর্ব্ববঙ্গে কেন, সমগ্র বাঙ্গালা দেশেই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বংশের আদি পুরুষ রঘুনাথ—মহারাজা

* অম্বিকাচরণ ঘোষ প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাস। অম্বিকা বাবু চাঁদরায় কেদাররায় সম্বন্ধে কত অল্প অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত অংশটুকুই তাহার পরিচায়ক।

মানসিংহের আদেশে চাঁদরায় ও কেদাররায়কে পরাজিত করিয়াছিলেন এইরূপ একটী প্রবাদ বংশপরম্পরানুগতভাবে সে বংশে চলিয়া আসিতেছে—উহাও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বোধে এখানে উদ্ধৃত করিলাম—"রঘুনাথ বাদশাহের আদেশক্রমে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কেদাররায়কে (দ্বাদশ ভূঁইয়ার অন্যতম) শাসন করার জন্য নিয়োজিত হন। চাঁদরায় ও কেদাররায় সর্ব্বদাই বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত ছিল। রঘুনাথ কৌশলে চাঁদরায় ও কেদাররায়কে বন্দী করিয়া রাজবাটী লুণ্ঠন করেন। লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রায় সমস্তই বাদশাহকে দেওয়ার নিয়ম ছিল। একচতুর্থাংশ লুণ্ঠনকারীর প্রাপ্য ছিল। রঘুনাথ লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত একখানি দশভূজা মূর্ত্তি মাত্র আনিয়াছিলেন এবং ঐ মূর্ত্তি একজন সিদ্ধপুরুষ কর্ত্তৃক স্বীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ দশভুজা মূর্ত্তিই এখন সুসঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। * * * চাঁদরায় কেদাররায়কে পরাজিত করিলে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথকে পঞ্চহাজারী উপাধিতে বিভূষিত করিয়া দিলেন।"

বলা বাহুল্য যে ইহার সহিত কোনও ঐতিহাসিক সত্যের সম্বন্ধ নাই, কারণ কি ইউরোপীয় পর্য্যাটকগণের ভ্রমণ-কাহিনী, কি জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস, কি আকবর-নামা কোথাও কেদার রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মানসিংহের সাহায্যকারী রূপে সুসঙ্গরাজ পরিবারের পূর্ব্ব-পুরুষ রঘুনাথের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেদার রায়ের সহিত যখন মানসিংহের যুদ্ধ হয় তখন যে যে বীর পুরুষ তাঁহার সহকারী রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহাদের উল্লেখ আছে, যদি রঘুনাথ প্রকৃত পক্ষেই কেদার রায়কে পরাজয় করিতে মানসিংহের সহায়তা করিতেন তবে নিশ্চিতই ইতিহাসে তাঁহার নামোল্লেখ থাকিত; যখন তাহা নাই তখন কোনরূপেই এ কিংবদন্তী সত্যরূপে গ্রহণকরা যাইতে

পারে না। তবে যদি সুসঙ্গ রাজবংশ তেমন কোনও উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ ও উপযুক্ত নিদর্শন উপস্থাপিত করিয়া আমাদের এ উক্তির অলীকত্ব প্রদর্শন করিতে পারিতেন তবে সে ভিন্ন কথা ছিল, নচেৎ আমরা তদানীন্তন ঐতিহাসিক ও পর্য্যাটকগণের ঐতিহাসিক বিবরণী উপেক্ষা করিয়া ইহা সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। ইতিহাস প্রমাণ চাহে —বাক্য চাহেনা। যাহা সত্য আমরা তাহাই চাহি।

এ ত গেল কিংবদন্তীর কথা। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা সাহিত্যেও যে সকল লেখক চাঁদরায় ও কেদার রায় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন তাহারাও নানারূপ কাল্পনিক সিদ্ধান্তের আলোচনা দ্বারা প্রকৃত ইতিহাস রচনার পথে বহু কণ্টক উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১২৯১ সালের চৈত্র সংখ্যার 'ভারতী' পত্রে প্রকাশিত 'শ্রীপুরের ভৌমিক চাঁদরায় ও কেদার রায়' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় ইহাঁদের পরিচয় সম্পর্কে যেরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই হাস্যজনক। কৈলাস বাবু লিখিয়াছেন "প্রবল পরাক্রান্ত ভৌমিক চাঁদরায়ের সম্বন্ধে 'ভক্তমাল' গ্রন্থে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

'————————চাঁদরায় নাম।
জমিদার অতি আঢ্য দস্যুবৃত্তি কাম॥
তিন লক্ষ মুদ্রাথায় কর নাহি দেয়।
নবাব আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায়॥
লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়।
নবাব তাহার সনে যুদ্ধে না পারয়॥
শক্তি-মন্ত্র-উপাসক দুর্গোৎসব করি।
প্রজাদণ্ড করি লয় পূজা ছল করি॥
ছাগল মহিষ বধ লক্ষ লক্ষ করে।
গো-ব্রাহ্মণ আদি বধ করিতে না ডরে॥'

'ভক্তমালের' চাঁদরায়ের সহিত বিক্রমপুরের চাঁদরায়ের যে কোন সম্বন্ধ নাই, কৈলাস বাবু একটু অনুসন্ধান করিলেই তাহা জানিতে পারিতেন। কোনও ঐতিহাসিক তথ্যের এইরূপ কাল্পনিক বিবরণ প্রকাশ করা ন্যায়ানুমোদিত নহে। 'ভক্তমালের' চাঁদরায় দুর্দ্দান্ত, দেব-দ্বিজ-দ্বেষী, এমন কি গো-হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না, আর বিক্রমপুরের চাঁদরায়ের দানশীলতা, মহত্ত্ব, দেব-দ্বিজ-ভক্তি, গুরু-ভক্তি ইত্যাদি বিবিধ সদ্‌গুণরাজির বিবরণ শুধু ইতিহাসের বক্ষে নহে, পর্য্যাটকগণের লেখনী-মুখে নহে, এখনও বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে তাঁহাদের দানশীলতা ইত্যাদি সম্পর্কে বহু জন-প্রবাদ প্রচলিত। এখনও কোন নিন্দুক বা পরশ্রী-কাতর স্ত্রী-পুরুষের প্রতি কটাক্ষ পাত করিতে হইলে বিক্রমপুর অঞ্চলে,—

"খায় লয় চাঁদরায়ের, গুণগায় কেদার রায়ের" এরূপ শ্লেষ-সূচক প্রবচন বলিয়া থাকে। 'ভক্তমালের' চাঁদরায় ও বিক্রমপুরের চাঁদরায় যে ভিন্ন ব্যক্তি, আমাদের সে উক্তির সমর্থন জন্য 'বিশ্বকোষ' নামক বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ হইতে ভক্তমালের চাঁদরায়ের বিস্তৃত পরিচয় এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল। "চাঁদরায়—বহু সম্পত্তিশালী একজন জমিদার, ইহার বাসস্থান রাজমহাল। রায় মহাশয় [illegible]াঢ্য হইয়াও অসচ্চরিত্র ও দস্যু দলপতি ছিলেন এবং নিজেও দস্যুবৃত্তি করিতেন। প্রজাপীড়ন ও পরধন লুণ্ঠনই ইহাঁর প্রধান ব্যবসায় ছিল। দিন দিন বড়ই গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। নবাবের অধীনতা তাঁহার পক্ষে ভাল লাগিল না, তিনি রাজকর বন্ধ করিয়া দিলেন। এখন তিনি এক প্রকার স্বাধীন। নবাব জানিতে পারিয়া কর আদায়ের জন্য লোক পাঠাইলেন, চাঁদরায় তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ইনি অধীনস্থ দস্যুদল দ্বারা নবাবের প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন। নবাব বহু যত্নেও তাহা নিবারণ করিতে কৃতকার্য্য

হইলেন না। চাঁদরায়ের ভয়ে ও অত্যাচারে লোক সকল পথে ঘাটে বাহির হইতে সাহস পাইত না। সতীত্বনাশ, সাধুর অপমান প্রভৃতি সমস্ত অসৎ কার্য্যই ইহার অঙ্গ-ভূষণ ছিল। ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ দুর্ব্বল নিরীহ প্রজাবর্গের উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। পূজার সময় দেবীর নিকট লক্ষ লক্ষ ছাগ মহিষ প্রভৃতি বলি দেওয়া হইত। গো-হত্যা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাপ আচরণেও ইনি ভীত ছিলেন না।"

"কিছুদিন পরে পাপের ফল ফলিল, দস্যুপতি চাঁদরায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অনেকের বিশ্বাস একটী ব্রহ্মদৈত্য চাঁদরায়ের দৌরাত্ম্য দেখিয়া ইহাঁর শরীরে আশ্রয় করে। ইহাকে বিনাশ করিয়া প্রজাবর্গের শান্তি স্থাপনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। চাঁদরায়ের কনিষ্ঠের নাম সন্তোষ রায়। সন্তোষ অনেক বৈদ্য আনাইয়া ইহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। পাপের ফল দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। সন্তোষ রায় গড়েরহাট নিবাসী নরোত্তম ঠাকুরকে আনাইয়া ইহাঁকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই চাঁদরায় নীরোগ হইলেন। নরোত্তম ঠাকুরের ধর্ম্মোপদেশে ইহার মতিগতি ফিরিয়া গেল। ইনি সকল অসদাচরণ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্রও পরম বৈষ্ণব হইয়া পড়িলেন। প্রজাবর্গের শান্তি হইল। নবাবও প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে রাজকর পাইতে লাগিলেন।" * (ভক্তমাল) কৈলাস বাবু কিরূপে যে 'উদোর পিণ্ডিবুদোর ঘাড়ে' ফেলিয়াছিলেন তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। একের কলঙ্কে অপরের শুভ্র যশ কালিমা-মণ্ডিত করিতে যাওয়া বস্তুতঃই গ্লানিজনক ও অতীব নিন্দনীয় ব্যাপার। এখন বোধ হয় 'ভক্তমালের' চাঁদরায় ও বিক্রমপুরের চাঁদরায় অভিন্ন ব্যক্তি এরূপ গুরুতর ভ্রম কাহারো হইবে না।

* বিশ্বকোষ—চাঁদরায় শব্দ দ্রষ্টব্য।

চাঁদরায় কেদাররায়ের বংশ-পরিচয় লইয়া বড়ই গোলযোগ। ইহাদের বিষয়ে বঙ্গজকায়স্থ-সম্প্রদায়ের কোনরূপ 'কুল-পঞ্জী' বা 'ঘটককারিকায়' কোন কথার উল্লেখ নাই তাহা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইদিলপুরের ঘটকগণ বঙ্গজকায়স্থতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন বলিয়াই প্রকাশ, দুঃখের বিষয় তাঁহাদের বংশোদ্ভব শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণই উক্ত রায়বংশ সম্পর্কিত কোন বিবরণ ঘটককারিকায় নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উপর আর কোন কথা চলেনা। 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট এ বংশের ঘটককারিকা আছে বলিয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতেও উহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বিক্রমপুর পরগণায় যাহারা যাহারা চাঁদরায় ও কেদাররায়ের বংশোদ্ভব বলিয়া দাবী করেন তাহাদের নিকট হইতে যে যে বংশাবলী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি এস্থলে তাহারি আলোচনা করিলাম। ইহারা দে বংশীয় বঙ্গজকায়স্থ বলিয়াই চিরপরিচিত। কথিত আছে যে এবংশের আদিপুরুষ নিমরায়, কর্ণাট হইতে আসিয়া বিক্রমপুরস্থ আড়াফুলবাড়িয়া নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'বারভূঁইয়া শীর্ষক প্রবন্ধে এবিষয়ে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে—'The tradition is, that about a hundred and fifty years before the reign of Akbar, Nimrai came from Karnata and settled at Araphulbaria in Vikrampur. He is believed to have been the first Bhuan, and to have obtained the sanction of the ruling monarch to his retaining the title as an hereditary one in family.' * ওয়াইজ সাহেবের মতে নিমরায় সম্রাট্ আকবরের রাজত্বের

বংশ-পরিচয়।

* (James Wise — On the Barah Bhuyah, Asiatic Society's Journal. 1874.)

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কর্ণাট হইতে বিক্রমপুরস্থ আড়াফুলবাড়িয়া গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় অনুমান করেন, যেসময়ে সেনরাজগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের স্বদেশবাসী নিমরায় আগমন করেন। আমরা বিক্রমপুর হইতে যে দু'খানি বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে কিন্তু নিমরায়েরও পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পুরুষের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—
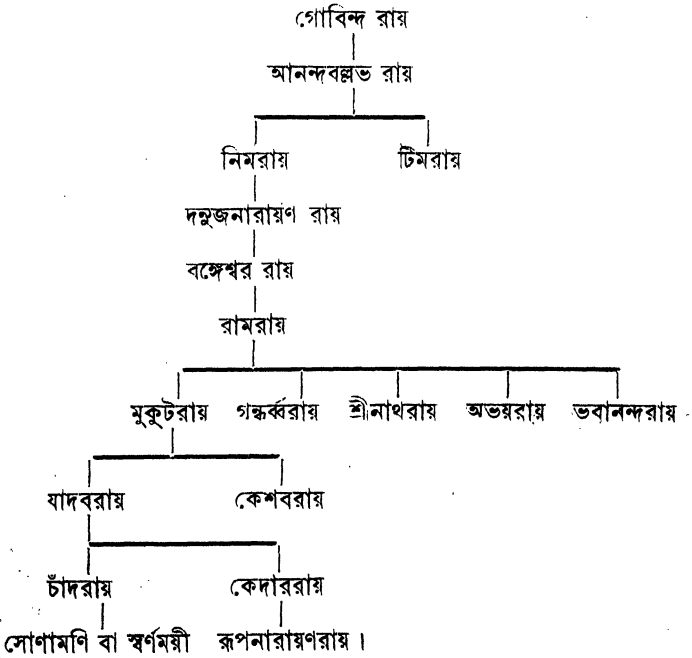
যদি এবংশাবলীখানা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে গোবিন্দরাম রায়ই কর্ণাট হইতে বিক্রমপুরে আগমন করিয়াছিলেন।

নিমরায়ের কর্ণাট হইতে আগমনবার্ত্তা ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের প্রবন্ধ ব্যতিরেকে অন্যত্র তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়েরও যথোচিত অনুসন্ধান আবশ্যক। এ কুর্চ্চিনামাখানা মূলচর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রায় মহাশয়ের সাহায্যে সংগৃহীত। দুর্গাচরণ বাবু উক্ত রায়বংশের অধস্তন পুরুষ বলিয়া বিক্রমপুরের অনেকেই জ্ঞাত আছেন। লেখকের স্বগ্রামবাসী বিধায় ইহাঁর নিকট উক্ত রায় বংশের অনেক কথাই শুনিয়াছি। ওয়াইজ সাহেব 'বারভূঁইয়া শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিবার সময় ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় গুরুচরণ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে বহু বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু ডাক্তার সাহেবের কার্য্য শেষে সে সকল কাগজ পত্র আর ফিরিয়া পান নাই বলিয়া শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রায় মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি। ডাক্তার ওয়াইজ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ ব্যপদেশেই হউক বা অন্যরূপেই হউক তদীয় 'বারভূঁইয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে ইহাদের সম্বন্ধে শুধু এই টুকু লিখিয়াছেন যে 'After the death of Chand Rai and Kedar Rai nothing is known of the family. The elder branch, it is said become extinct, but the descendants of a younger son still survive and reside at Mulchar south of Munshigunj.' এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রাম নিবাসী ৺ নীলকমল রায়, কালীকমল রায় ভ্রাতৃদ্বয় ও কার্ত্তিকপুর নলমুরির রায়েরা এই রাজবংশোদ্ভব বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, স্বর্গীয় নীলকমলবাবু ও কালীকমল বাবুর পুত্রগণ অদ্যাপি জীবিত আছেন। দক্ষিণ বিক্রমপুরের দেবভোগ গ্রামেও ইহাঁদের জ্ঞাতি আছে বলিয়া শুনা যায়। উত্তর বিক্রমপুরস্থ রাউতভোগ গ্রামবাসী দে বংশীয় রায় উপাধিধারী কায়স্থগণও আপনাদিগকে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট হইতেও একখণ্ড বংশ-লতা সংগ্রহ করিয়াছি, সে বংশলতার সহিত

দুর্গাচরণ বাবুর প্রদত্ত বংশলতার যে টুকু পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে এখানে তাহার প্রকাশ করিলাম। দুর্গাচরণ বাবুর প্রদত্ত বংশাবলী দ্বারা জানিতে পারি যে যাদব রায়ের দুই পুত্র চাঁদরায় ও কেদাররায়, কেদার রায়ের পুত্র রূপনারায়ণ রায় আর চাঁদ রায়ের কন্যা সোণামণি বা স্বর্ণময়ী, রাউত ভোগের রায় মহাশয়গণের বংশাবলী হইতে জানা যায় যে যাদব রায়ের পুত্র চাঁদরায়, চাঁদরায়ের পুত্র কেদার রায়, কন্যা স্বর্ণময়ীর কোন কথারই উল্লেখ নাই!* বোধ হয় এ সকল কারণেই বাঙ্গালা সাহিত্যেও দুইমত দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ বলেন চাঁদ রায়ের পুত্র কেদার রায়, আবার কাহারও কাহারও মতে ইহাঁরা দুই ভাই ছিলেন,—স্বর্ণমণি ও ঈশাখাঁ সম্পর্কিত ঘটনা অলীক। এ বিষয়ের মীমাংসা করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ একই বংশের দুইখানা কুর্চ্চিনামার এরূপ প্রভেদ কেন? ইহার মীমাংসা করিতে হইলে প্রচলিত জন-প্রবাদ ও বৈদেশিক লেখকগণের লিখিত বিবরণী ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই। আমরা চির প্রচলিত কিংবদন্তী হইতে জানিতে পারি যে চাঁদ রায় ও কেদার রায় দুই ভ্রাতা ছিলেন, এ প্রবাদ বিক্রমপুরের প্রায় সর্ব্বত্রই সুপ্রচলিত। জন-প্রবাদকে উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু তদানীন্তন লেখকগণের লিখিত বিবরণী কোনরূপেই উপেক্ষা করা চলে না। ১৫৯৯ খ্রীঃ অঃ নিকোলা পিমেণ্টা তাঁহার 'Relatio Historica de Rebus in India Orientali' নামক গ্রন্থে বিক্রমপুরের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের নামও কিঞ্চিৎ বিবরণী আছে, তাহা হইতে জানিতে পারি যে কেদার রায় শ্রীপুরের অধীশ্বর ছিলেন, ইহাঁরা দুই ভ্রাতা,—জ্যেষ্ঠ চাঁদ রায়। পিমেণ্টা শ্রীপুরে কিছুদিন থাকিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এরূপ স্থলে তাঁহার লিখিত বিবরণীর যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। অতএব চাঁদ রায়

কেদাররায় যে দুই ভাই ছিলেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এখন সোণামণি সম্পর্কিত কথা—তাহা যথা স্থানে আলোচনা করা হইল। প্রতাপাদিত্য কুলীন কায়স্থ ছিলেন, কাজেই ঘটককারিকা ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে বলিয়া নানারূপ মতদ্বৈধ উপস্থিত হইতে পারে নাই, কেদার রায় অকুলীন ছিলেন বলিয়াই তাহার সম্বন্ধে দেশের ইতিহাস মৌনী, তাই নানা প্রকারের মত ভেদ পরিলক্ষিত হয়। *

রামরাম বসু মহাশয়ের লিখিত 'প্রতাপাদিত্য—চরিত্র' নামক গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে 'এদিকে ক্রমে ক্রমে কেদার রায় প্রভৃতি ভূঁইয়াদিগকে নিপাত করিয়া তাহাদের রাজ্য লইল।' ঐতিহাসিক সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ও বিশেষরূপ আলোচনা না করিয়াই উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। 'বসু মহাশয় লিখিতেছেন যে, প্রতাপাদিত্য কেদার রায় প্রভৃতি ভূঁইয়াদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। * * প্রতাপাদিত্যের সময় বারজন ভূঁইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে নয়জন মুসলমান ও তিনজন হিন্দু। * মুসলমানদিগের মধ্যে কেবল সোণারগাঁ বা কত্রাভুর ঈশাখাঁর বিবরণই জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহার সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের কথা কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না এবং তিনি অন্যান্য সমস্ত ভূঁইয়াদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ১৬০০ খ্রীঃ অঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। সে সময়ে জেসুইট পাদ্রীগণ এদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রতাপাদিত্যের সহিত ঈশাখাঁর যুদ্ধের কোন কথাই বলেন নাই, বরঞ্চ তাঁহারা ঈশাখাঁ মসনদ্‌আলিকেই সকল ভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তাহার পর বসু মহাশয় কেদার রায়কে যুদ্ধে পরাজয় করার যে কথা লিখিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

* বিস্তারিত সামলোচনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

জেসুইট পাদ্রীগণের বিবরণ অবলম্বন করিয়া ডুজাস্রিক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে, পার্শা প্রভৃতির গ্রন্থে ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, কেদার রায়ের সহিত আরাকান রাজ ও মানসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধের কোন কথাই নাই এবং জেসুইট পাদ্রীগণ প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় উভয়কেই তুল্য ক্ষমতাশালী বলিয়াছেন। * মানসিংহ ১৬০২-৩ খ্রীঃ অঃ প্রথমে কেদার রায়কে আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে সম্যক্‌রূপ কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ১৬০৪ খ্রীঃ অঃ পুনরাক্রমণে তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন, পরে কেদার রায়ের মৃত্যু ঘটে। * সুতরাং কেদার রায় যে মৃত্যু পর্য্যন্ত অসীম ক্ষমতাশালী ছিলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। †

প্রতাপ ও কেদারের চরিত্রালোচনা।

প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের চরিত্র সমালোচনা করিলেও আমরা কেদার রায়ের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাই। ইতিহাস ও কিংবদন্তী হইতে যাহা জানিতে পারা যায় তাহাতে চাঁদ রায় কিংবা কেদার রায়ের চরিত্র সম্বন্ধে কোনরূপ কলঙ্ক কালিমার পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের চরিত্র সম্বন্ধে বহুবিধ অপবাদ প্রচলিত আছে, সে সকল অপবাদ অপ্রকৃতও নহে। আমরা এখানে তাহার কয়েকটির বিষয় উল্লেখ করিলাম (১) বসন্ত রায়ের

---

* The King of Patanw was Lord of the greatest part of Bengala, until the Mogal slew their last king. After which twelve of them joined in a kind of aristocracy and vanquished the Mogals, and still notwithstanding Mogul's greatness, are great Lords specially he of Sripur and of Chandecan (Purcha's His Pilgrims.) শ্রীপুরের কেদার রায় এবং চ্যাণ্ডিকানের প্রতাপাদিত্য।

† নিখিল বাবুর 'প্রতাপাদিত্যের' টিপ্পনী ১১৭-১৮।

হত্যা—ইহা প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের নিষ্ঠুরতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত (২) বীরবর কার্ভালোকে কৌশলে নিধন। কেদার রায় কার্ভালোকে আশ্রয় দিয়া তাঁহার সাহায্যে আরাকান রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিজয় লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর প্রতাপ আশ্রিত কার্ভালোকে আরাকান রাজের ভয়ে গোপনে হত্যা করিয়া শুধু ভীরুতা নহে—হিন্দুর আশ্রিত—বাৎসল্য-মহাধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। (৩) ভিক্ষা-প্রার্থিনী রমণীর স্তন কর্ত্তন কোনরূপেই সমর্থন করিতে পারা যায় না। দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার এত গৌরব, অধীনতা ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার এত মহত্ত্ব, নচেৎ মনুষ্যত্বের হিসাবে বেভারিজের ভাষায় বলিতে হয়, Pratapaditya was a cruel monster ; যদি বীরত্বে, মহত্ত্বে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে স্বদেশ প্রেমের চরমোৎকর্ষতায় কাহাকেও শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে হয়—সে কেদার রায়। কি আরাকান রাজের সহিত যুদ্ধে, কি মোগল সেনাপতিগণের সহিত বীরত্ব প্রকাশে, কেদাররায় যেরূপ অদম্য সাহস, তেজো-বীর্য্য ও রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন চিরকাল অক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিয়া বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী প্রচার করিবে। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় মহাশয় বলেন যে 'বারভূঁইয়াগণের মধ্যে যদি কাহাকেও সর্ব্ব প্রথম আসন প্রদান করা হয় তবে তাহা বিক্রমপুরের কেদার রায়ের প্রাপ্য। ঈশাখাঁ মসনদআলি সর্ব্ব প্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে তিনিও মোগলপতাকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন। প্রায় সকলেই তৎপথাবলম্বন করেন, করিলেন না কেবল তিনটী মহাপ্রাণ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভূষণার মুকুন্দরায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য।'*

* ঐতিহাসিক চিত্র—১৩১২, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

কেদার রায়ের সময় নিরূপণ লইয়াও বাঙ্গালার লেখকগণ নানা প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভ্রম অতীব গুরুতর। 'বিশ্বকোষের' 'কেদার রায়' শব্দে এইরূপ লিখিত আছে,—"কেদার রায় সন্দীপের নিকট শ্রীপুরের রাজা। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজত্ব করিতেন।" প্রথমে ভাবিয়াছিলাম ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ, কিন্তু 'বিশ্বকোষের' চাঁদরায় শব্দেও এই ভ্রম দেখিতে পাইয়া সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। প্রতাপ, কেদার, ঈশাখাঁ প্রভৃতি সকলেই ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাল-কবলে নিপতিত হন। কেদার রায় ১৬০৩-৪ খ্রীঃ অঃ মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন, তিনি কিরূপে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৬৯২ খ্রীঃ অঃ শ্রীপুরে রাজত্ব করিতেন? ইহাকি এক প্রহেলিকা নহে? আশাকরি শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রবাবু 'বিশ্ব-কোষের' দ্বিতীয় সংস্করণে এই বিষম ভ্রমটি সংশোধন করিয়া দিয়া ইতিহাসের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবেন।

কাল-নিরূপণ।

পাঠান রাজবংশের শেষ নরপতি দায়ুদের সহিত বাঙ্গালায় পাঠান-রাজত্ব-অবসান হইলে মোগল সুবেদারগণ বাঙ্গালার শাসন-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। খান জহানের পর মুজঃফর খাঁ এবং মুজঃফর খাঁয়ের পরে ১৫৮০ খ্রীঃ অঃ রাজা টোডরমল্ল কর্ত্তৃক ১৫৮২ খ্রীঃ অঃ ওয়াশীল তুমারজমা প্রস্তুত হয়। রাজা টোডর মল্ল সমগ্র বাঙ্‌লা দেশকে ১৯ সরকারে ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। বঙ্গদেশের ভূমি তৎকালে খাল্‌সা ও জায়গীর নামে অভিহিত হইত, যে জমীর জমা বা আয় রাজকোষে আসিত তাহাকে খাল্‌সা ও যাহার আয় কর্ম্মচারীর ব্যায়-নির্ব্বাহার্থ ব্যয়িত হইত তাহার

ভুঁইয়াগণের বিদ্রোহের কারণ।

ওয়াশীল-তুমার-জমা

নাম জায়গীর ছিল। টোডর মল্ল খাল্‌সা ভূমির ৬৩, ৪৪, ২৬০ টাকা ও জায়গীর ভূমির ৪৩, ৪৮, ৮৯২ টাকা মোট ১,০৬,৯৩১৫২ টাকা বঙ্গরাজ্যের জমা নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার এই জমাবন্দোবস্তের যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাই ওয়াশীল-তুমার জমা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই সময়েই ভূঁইয়াগণের মধ্যে বিদ্রোহের সঞ্চার হয়। পূর্ব্বে যাঁহারা ভূঁইয়া নামে অভিহিত ছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে যে সুখ স্বাধীনতা ছিল উহা এককালে লোপ পাইল। ভূঁইয়াগণের প্রবল ক্ষমতা দেখিতে পাইয়া সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিবিদ্ সম্রাট্ আকবর সুকৌশলে বিচক্ষণ কর্ম্মচারীর সহায়তায় বঙ্গদেশের এ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। ভৌমিকগণ নিজ নিজ ক্ষমতার হ্রাস নির্বিবাদে সহ্য করিতে পারিলেন না, তাহারা আপনাদের মান-সম্ভ্রম ও সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত দলবদ্ধ হইয়া নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে বিরত হইলেন। এ বিষয়ে ভূঁইয়াগণেরও একটু সুযোগ ঘটিয়াছিল। তখন বাঙ্গালায় বড় গোলযোগ। পাঠানগণ পরাজিত হইলেও তাহারা সম্পূর্ণরূপে মোগলের অধীনতা স্বীকার করে নাই। বিদ্রোহী পাঠানগণ নানারূপে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বিবিধ স্থানে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া মোগল বাদশাহকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কাজেই আক্‌বর বাঙ্গালা জয় করিয়াও শান্তি সংস্থাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। মানসিংহ সুবেদার হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াই নানারূপ যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা শান্তি সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন। তাঁহার ঈশাখাঁ, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে বাঙ্গালায় শান্তি সংস্থাপন করিতে হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর সে ভীষণ গোলযোগের মধ্যে, যখন একদিকে মোগল-পাঠান ঘোরতর রণ-নিরত, মগ-ফিরিঙ্গিগণ শোণিত—লোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত, বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই যখন একরূপ অরাজকতা,

সে যুগে বঙ্গবীরগণ তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, বন্দুক-তরবারি কামান সহ নিজ দেশের ও আত্মীয় পরিবারের যে মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, সে কি কম গৌরবের বিষয়? তাহাদের সে বীরত্ব-কাহিনী জেসুইট্ পাদ্রীগণ, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নিরপেক্ষ ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বারভূঁইয়াগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে প্রতাপ, কেদার ও মুকুন্দরায়ই প্রধান। অন্যান্য ভূঁইয়াগণের ন্যায় চাঁদরায় ও কেদার রায় পাঠান রাজত্বকালে ভূঁইয়া শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় এখন আর মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। মোগল সম্রাট্ ও বিক্রমপুরকে সরকার সোণার গাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহার অধীন ভূখণ্ড বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু মোগলের এ ঘোষণায় কোন ফলই হইল না,—বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায় ও মোগলের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিক্রমপুরের স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। স্বাধীন ভূঁইয়া, পাল ও সেনরাজগণের ক্রমিক অধঃপতনের পরে বিক্রমপুর জনপদে এক কেদার ব্যতীত আর কেহই স্বাধীনতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে পারেন নাই। চাঁদরায় ও কেদার রায়ের বীরত্ব সম্বন্ধে হর্টন রাইলির রালফ্ ফিচের গ্রন্থে নিম্নলিখিত রূপ লিখিত আছে, 'From Bacala I went to Seerepore which standeth upon the river Ganges. The King is called Chandry. They be all here abouts rebels against their king Zebaldim Echebar, for here are so many rivers and islands that they flee from one to another, whereby his horsemen can not prevaile against them. Great Store of cotton cloth is made here" * ইহা হইতে অনেক বিষয়

* Harton Ryley's Ralph Fitch P. P. 118—119.

পরিষ্কার রূপে জানিতে পারা যায়। ১৫৮৬ খ্রীঃ অঃ ফিচ শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, মোগলের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়াও যে তাঁহারা অক্ষুণ্ণ ভাবে কিছুকাল স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—তাঁহার মূলে একদিকে যেমন বীরত্ব ও তেজস্বিতা অপর দিকে তেমন নদ-নদী-সঙ্কুলতা। প্রকৃতি দেবীও বহু পরিমাণে সাহায্য করিতেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ, মোগল সৈন্যগণ স্থলযুদ্ধে সুনিপুণ হইলেও জলযুদ্ধে তাদৃশ নিপুণ ছিলেন না, অন্যদিকে পূর্ব্বাঞ্চলের পথ ঘাট দ্বীপ-নদীও তাহাদের সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল। এই সব নানা কারণেই কেদার, প্রতাপ প্রভৃতি বীরগণ একদিকে বীরত্ব ও সাহসিকতা, অপরদিকে জননী জন্মভূমির নৈসর্গিক সহায়তা বলে অমিত তেজে স্বাধীনতাবলম্বন করিয়াছিলেন।

কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর সুবর্ণগ্রাম হইতে নয় ক্রোশ দূরে কালীগঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঈশাখাঁ—সোণাবিবি।

দেশের এইরূপ ভীষণ গোলযোগের সময় বারভূঁইয়াগণ নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মোগল সম্রাট্ আকবর সুদীর্ঘ জীবন-সন্ধ্যায় বারভূঁইয়াগণের বিদ্রোহ-সমাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'যশোহর নগর ধামের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের চাঁদ ও কেদার রায়, খিজিরপুরের ঈশাখাঁ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত ভূম্যধিকারিগণের স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ সম্রাট্‌কেও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই তিনি বারভূঁইয়ারূপ ক্ষুদ্র পতঙ্গ কয়টিকে দমন করিবার জন্য মানসিংহকে সময়ে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিবার মন্ত্রণা করিতেছিলেন। এহেন বারভূঁইয়াগণের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন যে কতটা দৃঢ় হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সে সময়ে আবার বারভূঁইয়াগণের মধ্যে ধনবলে ও জনবলে খিজিরপুরের ঈশাখাঁ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এই খিজিরপুর সরকার সোণারগাঁয়ের অন্তঃভুর্ক্ত এবং বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জ মহকুমার এক মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত।* উহাই এখন হাজিগঞ্জ নামে অভিহিত। খিজিরপুর, কত্রাভুপুর বা হাজিগঞ্জ একই স্থানের বিভিন্ন নাম।

---

* Khizirpur is generally associated with 'Isa Khan's name. It is situated about a mile North of the Modern narayanganja, and close to it is one of the forts built by Mir jumla in the seventeenth century, which is called the Hájiganj, or Khizirpur, Killah.

ঈশাখাঁর জীবন-বৃত্তান্ত বিশেষরূপ উল্লেখ যোগ্য বিধায় আমরা সংক্ষেপে এখানে তাহার আলোচনা করিলাম। কথিত আছে যে (১৪৯৩—১৫২০ খ্রীঃ অঃ) মধ্যে হোসেন সাহার রাজত্ব সময়ে অযোধ্যা প্রদেশবাসী কালিদাস গজদানী নামক বাঁইশ রাজপুত বংশোদ্ভব জনৈক ব্যক্তি বাণিজ্য-ব্যপদেশে গৌড় নগরে আগমন করেন। পরিশেষে ইনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সোলেমান খাঁ নামে অভিহিত হ'ন ও হোসেন শাহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ফতেমাথানুম নাম্নী পাঠান যুবতীর পাণি—গ্রহণ করেন। এই যুবতীর গর্ভে সোলেমান খাঁর দু'টী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে, পুত্রদ্বয়ের নাম ঈশা ও ঈশমাইল এবং কন্যার নাম সাউন্নেসা বেগম।* এই সোলেমান খাঁ সমুদয় ভাটি প্রদেশের অধিকার লাভ করেন এবং তৎকালীন বঙ্গদেশের নৃপতি বাহাদুর খাঁ কর্ত্তৃক 'মস্‌নদ আলী' উপাধি ভূষণে ভূষিত হ'ন। কেহ কেহ বলেন যে হোসেন সাহ ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রের মৃত্যু হইলে দেশময় যখন এক অরাজকতা উপস্থিত হয় ও হোসেন সাহের উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধ বাঁধিয়া যায়—সেই সুযোগে সুচতুর সোলেমান খাঁ আপনাকে হোসেন সাহের প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করতঃ সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

ঈশাখাঁ মসনদ্ আলী।

এসময়ে শূরবংশীয় মহাবীর শের খাঁ গৌড় আক্রমণ করেন, কিন্তু বঙ্গদেশ জয় করিবার পূর্ব্বেই শুনিতে পান যে, তদীয় বেহার রাজ্য আক্রমণোদ্দেশে সম্রাট হুমায়ুন চুণার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, এ সংবাদ শুনিয়া শেরখাঁকে বাধ্য হইয়াই বঙ্গ-বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। কিয়ৎকাল পরে শের খাঁর পুত্র ছলিম খাঁ ও তদীয় সেনাপতি

* Elliot's History of India Vol. VI, Blochman's Ain-i-Akbari, J. R. A. S. B. 1874 P. 209—14. 'মস্‌নদ আলীর ইতিহাস' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

তাজ খাঁ গৌড় আক্রমণ করেন,—সে যুদ্ধে সোলেমান খাঁ পরাজিত ও নিহত হ'ন এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় ঈশা খাঁ ও ইস্‌মাইল খাঁ শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া তুরস্ক দেশবাসী এক বণিকের নিকট বিক্রীত হ'ন। কয়েক বৎসর পরে ইঁহাদের মাতুল কুতুবউদ্দীন বিশেষ কষ্ট ও যত্নদ্বারা তুরস্ক দেশ হইতে এই দুই ভ্রাতার উদ্ধার সাধন করিয়া তাহাদের নিকট স্বীয় দুই কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। অতঃপর ঈশা খাঁ তদানীন্তন গৌড়াধিপতি বায়েজিদ খাঁর অধীনে প্রথমতঃ সামান্য সৈনিকের পদ গ্রহণ করিয়া পরিশেষে নিজ ক্ষমতা প্রভাবে আড়াই হাজারি সেনানায়কের পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন; বায়েজিদ খাঁর মৃত্যুর পর দায়ুদ খাঁ সিংহাসনারোহণ করেন, ইনিই শূর-বংশীয় শেষ নৃপতি। সম্রাট্ আক্‌বরের বিরুদ্ধাচরণ করায় সম্রাট্-সৈন্যগণ কর্ত্তৃক দায়ুদ পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার সৈন্যদলের অধিকাংশই ঈশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে, ঈশা খাঁও এ সুবর্ণ-সুযোগ উপেক্ষা না করিয়া সে সমুদয় সৈন্যের সহায়তা বলে স্বাধীন নৃপতি রূপে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশা খাঁর রাজধানী খিজিরপুর সরকার সোণারগাঁর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এতদ্ব্যতীত উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের বহুস্থলেও ঈশা খাঁ স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রালফ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঈশা খাঁর রাজধানীতে গমন করেন, তিনি ঈশা খাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে * * * The chief king of all these countries is called Isacan, and he is chief of all other kings, and is a great friend to all Christians. * এদদ্ব্যতীত পিমেণ্টা, পার্কাস প্রভৃতি বৈদেশিক লেখকগণও ঈশা খাঁর বীরত্ব ও শ্রেষ্টত্ব সম্বন্ধে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। † এসকলের এখানে বাহুল্য উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

* Harton Ryley's Ralph Fifth P. 118.

† The King of Patanaw was Lord of the greatest part of Bengala, untill the Mogoll slue their last king. After, [illegible] twelve of them joyned in a kinde of Aristocratie and vanquished the Mogolls * * * and still notwithstanding the Mogolls greatnesse are great Lords, specially he of Siripur, and of eiandecan, above

এই ঈশাখাঁর সহিত চাঁদরায়েরও কেদাররায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে যদি তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ মনান্তর না হয় তাহা হইলে এই নদ-নদী-সঙ্কুল দেশে মোগলের শক্তি-বিস্তার অসম্ভব হইবে। কিন্তু তাঁহাদের এ মিলন-মঙ্গল-মধ্যে অশান্তির বীজ নিহিত ছিল। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে একবার ঈশাখাঁ কেদাররায়ের রাজধানী শ্রীপুরে আসিলে কোন প্রকারে চাঁদরায়ের একমাত্র দুহিতা স্বর্ণময়ীকে দেখিতে পাইয়া তদীয় রূপলাবণ্যে মোহিত হন। তাঁহার হৃদয়-পটে সে অপূর্ব্ব রূপসীর রূপ-লাবণ্য মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াই চাঁদরায়ের নিকট তদীয় দুহিতার পাণি-প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঈশাখাঁর এতাদৃশ অশিষ্টাচরণে রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয়ে ঘৃণা ও বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে যে, ঈশাখাঁ অর্থবলে চাঁদরায়ের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীমন্তখাঁকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সহায়তায় চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা সোণামণিকে করতলগত করতঃ তাঁহার পাণি-গ্রহণ করেন। *

সোণাবিবি।

all Mausudalim. Early Travels in India, Purchas's Pilgrimage published by R. Lepage & Co. 1864. Page 11. Chapter III.

* ডাক্তার ওয়াইজ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (VOL. XLIII Part I. 1874, P. 202) প্রকাশিত তদীয় বারভূইঁয়া শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে,'Between Isa Khan of Khizirpur,, whose stronghold was on the opposite bank of the Ganges, and the two brothers there was constant warfare. Isakhan made a successful raid into his enemies country. carried off and forcibly married Sonai (Svarnamayi), the only daughter of Chand Rai." ডাক্তার ওয়াইজের এই উক্তির সহিত প্রচলিত কিংবদন্তীর কিংবা অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিকগণের মতের মিল নাই। ঈশাখাঁ যেরূপ স্পর্দ্ধিত হইয়া সোণামণিকে বিবাহ করিবার জন্য চাঁদ রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন সেইরূপ

সোণামণিও ঈশাখাঁর শৌর্য্য-বীর্য্য দর্শনে মোহিতা হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া ঈশাখাঁর সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। * ঈশাখাঁ সোণামণির পাণি-গ্রহণ করিয়া তাহার নাম আলিনেয়ামত বিবি রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের লোকের নিকট সে নাম পরিচিত হয় নাই—তিনি চিরদিনই সোণাবিবি নামে পরিচিতা হইয়া আসিতেছেন।

সোণামণির অপহরণ-ঘটিত অপমানের তীব্র জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া চাঁদরায় অত্যল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। কেদার রায়ের হৃদয় হইতে অকলঙ্ক-কুলে কলঙ্ক-কালিমার সঞ্চারহেতু প্রজ্জ্বলিত প্রতিহিংসা-বহ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইলনা। ঈশাখাঁ যতদিন জীবিত ছিলেন

সমুচিত শিক্ষাও পাইয়াছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজ তাঁহার এ উক্তির সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। অতএব শ্রীমন্তের বিশ্বাসঘাতকতায় ঈশাখাঁর সোণামণিকে লাভ করিবার কথাই সঙ্গত বোধ হয়। এ বিষয়ে "সুবর্ণ গ্রামেরইতিহাস" প্রণেতা স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণীর সহিত বিক্রমপুরের প্রচলিত কিংবদন্তীর সামঞ্জস্য আছে। স্বরূপ বাবু তদ্‌রচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে "ঈশাখাঁ বিক্রমপুরের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায়ের পরমাসুন্দরী বিধবা কন্যা সোণামণিকে বিবাহ করিবার মানসে তথায় দূত প্রেরণ করেন। চাঁদরায় ও কেদার রায় শ্রবণ মাত্র জ্বলন্ত অগ্নিবৎ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রথম আক্রমণেই চাঁদ রায়, ঈশাখাঁর কলাগাইছার দুর্গ বিধ্বস্ত করেন। ঈশাখাঁ, ত্রিবেণীর দুর্গে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। চাঁদরায় ত্রিবেণী অবরোধ করিয়া খিজিরপুরের বহুতর অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন। ঈশাখাঁ মনে মনে স্থির করিলেন, কোনওরূপে সোণামণি আমার হস্তগত হইলেই চাঁদ রায় কন্যার শোকে বিহ্বল হইবেন এবং হয়ত যুদ্ধ করিতেও নিবৃত্ত থাকিবেন। ঈশাখাঁ অর্থ বলে চাঁদ রায়ের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষকে হস্তগত করেন। প্রধান কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সোণামণিকে ঈশাখাঁর হস্তে সমর্পণ করেন।" (সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস ১০৩-৪ পৃষ্ঠা)

* Sona Bibi won by the courage and address of her captor soon ceased to repine her lot, and renouncing Hinduism she embraced her husband's faith remaining throughout his life a devoted help-mate, and defending the kingdom against his enemies, kith and kin, even after his decease. Romance of an Eastern capital by E. F. Bradley Birt P. P. 79-80.

ততদিন যেমন তিনি পুনঃ পুনঃ তদীয় রাজ্যের বিভিন্নাংশ আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিন্দুমাত্রও শান্তি দেন নাই, তাহার মৃত্যুর পরেও তেমনই তিনি তদীয় ত্যক্ত রাজ্যাভিমুখে স্বীয় সৈন্য প্রেরণ করিতে থাকেন। সে সময়ে আরাকানদেশবাসী মগগণের অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষরূপে সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহলুণ্ঠন, স্ত্রীলোকের সতীত্বাপহরণ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দুষ্কার্য্য করিতে এই সকল মগগণ বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিতনা। ঈশাখাঁর বীরত্ব-প্রভাবে মগগণ তদীয়রাজ্য মধ্যে কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই, কিন্তু এখন তাহারা সুযোগ বুঝিয়া ঈশাখাঁর রাজ্য অধিকারের প্রলোভনে ধাবিত হইল। * রাজ্য অরাজক, কাজেই চারিদিক হইতে সকলেই সুযোগ বুঝিয়া সোণারগাঁর দিকে অগ্রসর হইল, মগদিগের অত্যাচারও ত্রিপুরেশ্বর এবং বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের ভীষণ আক্রমণ হইতে কে এখন ঈশাখাঁর রাজ্য রক্ষা করিবে? অরাতি-বৃন্দ সকলেই ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের সোণারগাঁ অধিকার করিতে কোনওরূপ ক্লেশ পাইতে হইবে না; অতি সহজেই উহা অধিকৃত হইবে, কিন্তু শীঘ্রই তাহাদিগের এ ভ্রম অপনোদিত হইল।

ঈশাখাঁর মৃত্যুর পর সোণাবিবি নিজহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সময় সোণাবিবি যে অপূর্ব্ব বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি শতমুখে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর ইতিহাসে এইরূপ রাজনীতি কুশলতা, স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনের ক্ষমতা সোণাবিবি ব্যতীত অন্য

* বিক্রমপুরে অদ্যাপি মগদিগের দ্বারা উৎপীড়িত কয়েকঘর ব্রাহ্মণের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। ইহারা জনসাধারণের নিকট 'মউগা ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত। ইহারা রায়োপাধিক ব্রাহ্মণ। মুন্সীগঞ্জ থানার নিকটবর্ত্তী কাঠাদিয়া নামক গ্রামে ইহারা বাস করিতেছেন। গ্রামস্থজনগণ ইহাদের সহিত সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম দূরে থাকুক আহারাদিও করে না। গ্রামবাসী কর্ত্তৃক এইরূপভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ইহারা

কোন রমণী প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিনা। কথিত আছে যে, ত্রিপুরার রাজা ও কেদার রায় সসৈন্যে সোণারগাঁয় উপস্থিত হইলেই কেদার রায় তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া দূত প্রেরণ করেন। তদুত্তরে সোণাবিবি বলিয়াছিলেন "আমার শরীরে একবিন্দু শোণিত থাকিতে বিনাযুদ্ধে আমার স্বামীর পরিত্যক্ত এক খণ্ড সামান্য ভূমিও কাহারো হস্তে সমর্পণ করিব না।" বীরাঙ্গনার এই অপূর্ব্ব বীর-বাণীতে কেদার রায় বিস্মিত হইয়াছিলেন। একি তাঁহাদের স্নেহপালিতা আদরিণী সেই স্বর্ণময়ী! একদিকে একজন বিধবা রমণী—অন্যদিকে ত্রিপুররাজ, মগগণ ও কেদার রায়—ত্রিশক্তির সম্মিলিত আক্রমণ!

উভয় পক্ষে বহুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। সোণাবিবি স্বয়ং সৈনিকগণকে পরিচালিতা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! একা রমণীর পক্ষে এইরূপ শক্তিশালী শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়-লাভ করা অসম্ভব। অবশেষে যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কোনরূপেই আর রক্ষা নাই, তখন তিনি স্বামীর প্রিয়তম দুর্গ শত্রু হস্তে সমর্পিত হওয়া অপেক্ষা ধ্বংস হওয়াই সঙ্গত বোধে সৈন্যগণকে শীতললক্ষা নদী তীরবর্ত্তী সাধের সোণাকুণ্ডা দুর্গে অগ্নি-সংযোগ করিতে আদেশ

এখন নিতান্তই অনাদৃত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইয়াও ইহারা এখন সমাজ কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়া অবস্থাপন্ন কৃষকদিগের ন্যায় আচারপরায়ণ হইয়াছে। কিংবদন্তী এই যে, যখন মগেরা বিক্রমপুরের নানাস্থান লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন এই কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং গৃহস্থ কুল-কামিনীগণ অপমানিতা হইয়াছিলেন। তদবধি এই ব্রাহ্মণগণ পতিত ব্রাহ্মণ রূপে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমানকালে ইহারা লুপ্তপদমর্য্যাদার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ সচেষ্ট। এখন বিদেশে আর ইহারা পতিতব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন না। মগদিগের এইরূপ লুণ্ঠনেও দুষ্কার্য্যে পূর্ব্বাঞ্চলের সামাজিক চিত্রের যে শোচনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা এই আলেখ্যে বিশেষরূপে পরিস্ফুট।

করিলেন, রাণীর আদেশে উহাতে অগ্নি-সংযুক্ত হইল, দেখিতে দেখিতে বহ্নির বিকটগ্রাসে ঈশাখাঁর দুর্গ ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে চলিল, আর প্রবল অগ্নি রাশিতে প্রকৃত বীরাঙ্গনার ন্যায় সোণাবিবি পতিপদ চিন্তা করিতে করিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন। নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী সোণাকুণ্ডা নামক স্থানে অদ্যাপি সেই দুর্গের শেষ চিহ্ন একটী মৃত্তিকা স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।*

---

* F. B. Bradley Birt তদীয় Romance of an Eastern Capital নামক গ্রন্থের ৭৯—৮০ পৃষ্ঠায় সোণাবিবির অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সনদ্বীপের যুদ্ধ।

যথন বিক্রমপুরে কেদার রায় এইরূপে সর্ব্বত্র নিজ বাহুবল প্রকাশে কীর্ত্তি-সঞ্চয় করিতেছিলেন, সে সময়ে আক্‌বরবাদশাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র (১৬০৫ খ্রীঃ অঃ) সেলিম জাঁহাগীর নামধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাঁহাগীর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালার বারভূঁইয়াগণের কাহিনী জ্ঞাত ছিলেন, সিংহাসনারোহণের পর ক্রমশঃই তাহাদের উদ্ধত ব্যবহারের কথা-শ্রবণে তিনি সে সকল বিদ্রোহী জমিদারগণের দমনার্থ অম্বরাধিপতি হিন্দুকুলাঙ্গার রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ভূঞাদলের নির্ম্মূলার্থ প্রেরণ করিলেন।

মহারাজ মানসিংহ বাঙ্গ্‌লাদেশে আসিয়াই প্রথমতঃ ভূঞাদলের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এ ভেদ ঘটাইতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতেও হয় নাই। কারণ, ভূঞাদল পূর্ব্ব হইতেই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার জামাতা চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের, রামচন্দ্রের সহিত ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যের, বিক্রমপুরাধিপতি কেদারের সহিত খিজিরপুরের ঈশাখাঁ মসনদ্‌আলির মনোমালিন্য সুচতুর মানসিংহের নিকট অধিক কাল গুপ্ত রহিল না।

ইহার উপরে আবার ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি স্বদেশ দ্রোহী কুলাঙ্গারগণ তাঁহার সহায়তায় নিযুক্ত হইল। এই কুলাঙ্গারদ্বয়

কিরূপভাবে এবং কোন্ পথে সৈন্য পরিচালনা করিলে, যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা হইবে, তৎসম্পর্কে মানসিংহকে পরামর্শ দিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। সে ভীষণরণ-কাহিনী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা কেদার রায়ের সহিত আরাকানরাজের সংঘর্ষের বিবরণী লিপিবদ্ধ করিলাম।

কেদাররায়ের রাজ্যসীমা।

কন্যার অপহরণ-জনিত শোকে চাঁদরায় কাল-কবলে নিপতিত হইলে কেদার রায় একাকী আপনার পরাক্রম-বলে স্বীয় রাজত্ব সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের কতকাংশ এবং সনদ্বীপ তাঁহার অধিকার ভুক্ত হয়। সনদ্বীপ শ্রীপুর বন্দরের ছয়লিগ দূরে অবস্থিত ছিল। ইহা প্রাকৃতিক সমুদ্র প্রাচীরে সুবেষ্টিত ছিল বলিয়া ইহার অধিবাসীগণের

বঙ্গে পর্ত্তুগীজ প্রভাব ও সনদ্বীপ।

অজ্ঞাতে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিতনা। সনদ্বীপে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত বলিয়া উহার প্রসিদ্ধি বঙ্গের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সনদ্বীপের অধিকার লইয়া বাঙ্গালী, মগ, ফিরিঙ্গী ও মোগলের মধ্যে যে ভীষণ রণ-লীলা সংঘঠিত হইয়াছিল তজ্জন্য ইহার ইতিবৃত্ত চিরদিন বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষরূপে উল্লিখিত থাকিবে। এই সনদ্বীপ নিজ অধিকারভুক্ত রাখিবার জন্য কেদার রায় কিরূপ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন—আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি, উহা হইতেই পাঠকবর্গ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে কেদার রায় কিরূপ অমানুষিক বীরত্বের; সাহসের ও রণ-নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন।

ভারতবর্ষে ১৫২৮ খ্রীঃ অঃ সর্ব্বাগ্রে পর্ত্তুগীজগণ পদার্পণ করিয়া ম্যাঙ্গালোর, কোচিন, সিলোন, গোয়া, নাগাপট্টন প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের সূত্রপাত করেন। বাঙ্গালাদেশে ১৫১৮ খ্রীঃ অঃ জনসিলভেরিয়া (John

Sylveria) নামক একজন পর্ত্তুগীজ ভ্রমণ ব্যাপদেশে আগমন করিয়া দেশীয় রীতি-নীতি ভাষা-আচার পদ্ধতি এবং বাণিজ্যের বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভ করিয়া বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। ভারতবর্ষের অন্যত্র যেমন পর্ত্তুগীজেরা সাম্রাজ্যগঠন প্রয়াসী হইয়া রীতিমত শাসন সমরক্ষণের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন বাঙ্গলা দেশের কোথায়ও তদ্রূপ করেন নাই। বাঙ্গলা দেশে ইহারা যোদ্ধ‍ৃবেশে দেখা দিয়াছিলেন। ১৫৩৮ খ্রীঃ অঃ একদল পর্ত্তুগীজ বাঙ্গলাদেশে আগমন করিয়া তদানীন্তন গৌড়াধিপতির সৈনিক বিভাগে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়। বাঙ্গলাদেশে পর্ত্তুগীজগণ 'দস্যু' নামে অভিহিত হইত, কারণ নিম্নবঙ্গের নদী সমূহে ইহারা জলদস্যু বেশে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও বালক-দিগকে অপহরণ করিয়া হয় গোয়ার দাসহাটে চালান দিত নচেৎ স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইত।* বিখ্যাত ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে 'ইহারা সমুদ্রোপকূলে এবং নদীমুখে প্রবিষ্ট হইয়া গ্রামকে গ্রাম বিনষ্ট করিয়া, দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া, রমণীগণের সতীত্ব-মর্য্যাদা বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বত্র ভীতির সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।' কবিকঙ্কণ কৃত চণ্ডীর একস্থানে পর্ত্তুগীজ জলদস্যু গণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে ;—

"ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হরমাদের ডরে॥"

---

* In 1538, a large body of Portuguese entered Bengal as military adventurers in the service of the king of Gour, * * * they used to engage in piratical voyages to the lower districts of Bengal, kidnapping the natives and pillaging and destroying the populated villages and towns at the mouth of the Ganges. The good old days of Honourable John Company Vol. III p. 160—85.

II. Early travels of Bernier—Bangabasi Edition.

এই সকল পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ অধিকাংশই বীর, রণ-কৌশল-নিপুণ এবং জলযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিল। ইহাদিগকে সৈন্যদল ভুক্তকরিয়া সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করিতে পারিলে মোগলগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার সুযোগ ও সুবিধা হইবে বলিয়া শ্রীপুর, চন্দ্রদ্বীপ, সুবর্ণ-গ্রাম প্রভৃতির অধিপতি স্বাধীন ভুঁইয়াগণ পর্ত্তুগীজদিগকে উপযুক্ত বেতনও সাহায্য দ্বারা নিজ নিজ রাজ্যে অবস্থা বুঝিয়া সৈনিকের পদে এমন কি সময় সময় সেনাপতির পদেও নিযুক্ত করিতেন। উপকূলবর্ত্তী,—বিশেষ নদ-নদী-সঙ্কুল স্থানের অধিপতিগণের নৌ-বলের একান্ত প্রয়োজন—সে নিমিত্তই নৌ-সমর-কুশল পর্ত্তুগীজগণের প্রতি বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায় প্রভৃতি ভুঁইয়াগণের বিশেষ লক্ষ্যছিল,—কেদার রায় স্বীয় সৈন্যবল বাড়াইবার নিমিত্ত এবং সৈন্যগণকে পাশ্চাত্য শিক্ষানুযায়ী সুশিক্ষিত করিয়া মোগল সৈন্যগণের গতিরোধ করিবার উদ্দেশেই কার্ভালো নামক একজন পর্ত্তুগীজকে স্বীয় নৌসৈন্য বিভাগের সেনাপতির পদে বরণ করিয়াছিলেন। কেদার রায় নিজেও বিশেষরূপেই নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন, কার্ভালোর সহায়তায় স্বীয় নৌ-শক্তি অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কার্ভালোর প্রকৃত নাম কার্ভালিয়ান, তবে ইনি সাধারণতঃ কার্ভালো বলিয়াই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সনদ্বীপ কেদার রায়ের রাজ্যভুক্ত ছিল, মোগলেরা পূর্ব্ববঙ্গজয়ের সময় সনদ্বীপ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়া উহা সরকার ফতেয়াবাদের অন্তঃর্ভুক্ত করিয়া ফেলে, মোগলদিগের এই অধিকার কেদার রায় অগ্রাহ্য করিয়া নিজকে পূর্ব্ববৎ সনদ্বীপের স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকেন এবং উহার পুনরুদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প হ'ন এবং কার্ভালোর সাহায্যে মোগল-সৈন্যদিগকে আক্রমণ

কার্ভালো বা কার্ভালিয়ান।

করেন। ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল—মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈনিকগণ সহজে তাঁহাদের অধিকৃত ভূমিখণ্ড ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন না, কেদার রায়ও দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে মোগলদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া সনদ্বীপ তাহাদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন। এই যুদ্ধে কার্ভালো অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করায় কেদার রায় তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ সনদ্বীপের শাসনভার অর্পণ করিয়া স্বীয় রাজধানী শ্রীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।*

কেদার রায় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কার্ভালো অতিশয় বীর্য্যবত্তার সহিত অল্পসংখ্যক পর্ত্তুগীজ সৈন্য লইয়া মোগলদিগের দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে দ্বীপের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইয়াছিল কোনরূপ সাহায্যের আশা নাই! দ্বীপবাসিগণ চারিদিকে উত্তেজনার সহিত বিদ্রোহী ভাব ধারণ করিয়াছে, দুর্গের বাহিরে আসিবার আর কোন উপায়ই নাই, অথচ দুর্গ মধ্যেও এইরূপ প্রচুর পরিমাণে রসদ ইত্যাদি সঞ্চিত নাই যে উহার সাহায্যে জীবন রক্ষা করিয়া বিদ্রোহীগণের সহিত যুদ্ধ চলিতে পারে; কার্ভালো এইরূপ বিপদে নিপতিত হইয়া কৌশল ক্রমে জনৈক পর্ত্তুগীজ বীরকে চট্টগ্রামের (Porto grando) পর্ত্তুগীজ গণের নিকট প্রেরণ করিলেন, চট্টগ্রামস্থ পর্ত্তুগীজগণের সেনাপতি ইমানুয়েল মাটুস (Emmanuel dee matos) চারিশত পর্ত্তুগীজ সৈন্যের সহিত সনদ্বীপে আগমন করিয়া অবরুদ্ধকারী সনদ্বীপ বাসিগণের

* The Mogols with the conquest of Bengala had possessed Sundiva. Cada raja still continuing his title. Under colour where of Carvalins and Manes, two Portugals conquered it in 1602. Purcha's Pilgrimes, Fourth part, Book V. 515, 1625.

সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করতঃ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত করিয়া কার্ভালো ও অন্যান্য অবরুদ্ধ পর্ত্তুগীজ সৈনিকগণের উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হন। বিজয়ী পর্ত্তুগীজগণ উক্তদ্বীপে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সনদ্বীপ কার্ভালো ও মানুটুস এই উভয় সেনাপতির মধ্যে বিভক্ত হয়। এই ঘটনা ১৬০২ খ্রীঃ অঃ সংঘটিত হইয়াছিল। *

কেদার রায়, রামচন্দ্র প্রভৃতি যেমন পর্ত্তুগীজগণের প্রতি অনুকূল ভাবাপন্ন ছিলেন, তদ্রূপ বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী ত্রিপুরা ও আরাকানের স্বাধীন রাজারাও পর্ত্তুগীজদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। আরাকান তখন মগ রাজার ও মগের দেশ বা মুলুক বলিয়া

---

* L' Ihe de Sundiva est fort proche de la terre ferme de Bengala, n'en estant esloigu'e que six lieues, viz a viz da port de Siripur. Elle est si forte de sibien reneparc'e de la nature, gu'il est presque impossible d' by a border, Sans le consentement des habitans. * * * * * Ceste Isle appartenoit de droict a 'vn des Roys de Bengala qu' on appelle Codary : mais il y avoit plusieurs anne'es qu'il n'en jouissoit pas, a' cause que les Mogores s'en estoient emparez par force. Or quodil scent que les Portugais S'en donna de sart bonne volunte' reion cant en bar sareur a' tons les droicts, qu'ily pouraoit pretendlre.

Elle fut prise l'an 1602. par vn reillant Capitaine Portugais, nomme Dominique Carualho natis de Mantargil, qui estoit an service du mesme Cadaray. N se saisle premierement de la fortere-sse, assiste'de quelques soldats Portugais, quil' aydhoient en ceste enterprise. Mais sotdain les naturels du paisl' assiegerent; tellement que se voyant pusse, il donno odvis aun Portugais, qui estoient en Chatigun, de ce qui se passoit, les priant de le vouloir secouri. Ce qu'ils firent en grande diligence, presant pour Capitai ne vn Portugais honneur de mogens, nomme Emmanual de matos ; bequel estal afle' an secoms avec quatre cens soldats, souta veste menten terre, de donna vule batai lle compale ank origina-

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আরাকান রাজ ও স্বীয় রাজ্য মধ্যে বহু সংখ্যক পর্ত্তুগীজকে আশ্রয় দান করিয়া সৈনিক বিভাগে কার্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। ইহারাও নৌ-যুদ্ধে নিপুণতা ও বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিয়া দেশীয় রাজন্যবৃন্দের নিকট হইতে প্রীতি, শ্রদ্ধা উচ্চপদ এবং প্রভূত ক্ষমতা এবং ভূসম্পত্তি লাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। কেদার রায়ের বীর্য্যবত্তায় বিশেষ পর্ত্তুগীজগণ তাহার অনুগ্রহে সনদ্বীপের অধিকার লাভে সমর্থ হওয়ায় তদানীন্তন আরাকান রাজ মেংরাজাগি বা সেলিমশা (Xilimxa) অগ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন, তাহার এইরূপ ক্রোধের যথেষ্ট কারণ ও বিদ্যমান ছিল—সে কথাই এখন বলিতেছি। আরাকান রাজ যে সমুদয় পর্ত্তুগীজকে স্বীয় রাজ্য মধ্যে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ফিলিপ ব্রিট্টো নামক একব্যক্তি তাহার অধীনে ভৃত্যের ন্যায় কার্য্যাদি নিষ্পন্ন করিত, সে ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিমত্তাও, কার্য্য-নৈপুণ্য এবং ক্ষমতা বলে আরাকান রাজের বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠে। সেলিমসা ও ইহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে পেগুর সাইরাম বন্দরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, ব্রিট্টো এইরূপ ক্ষমতালাভে এতদূর উদ্ধত হইয়া উঠে যে সে আরাকান রাজের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিবার উদ্যোগ করে, ব্রিট্টোর এইরূপ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া ক্রুদ্ধ আরাকান রাজ তাহাকে ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন ঠিক্ সেই সময়েই মহাবীর কেদার রায়, কার্ভালো প্রভৃতির সহায়তায়

---

res ; lesquels il mit a' van de route, de en tua plusieurs. Par le moyen de ceste victire, de le quel ques antres, quedes Portugais gaignerent depuis, ils demen retest maistres de toule l' esle laguelle Dominique Carualho de Emmanuel de matos se departirent antre eun deuk. (Histoire des Indes Orientales. L. E. P. Periec. Du jarrie IV Parte 1610. Chapitre XXXII.

জলযুদ্ধে মোগলদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় অধিকারভুক্ত সনদ্বীপ মোগলের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া কার্ভালোর উপর তথাকার শাসনভার ন্যস্ত করিয়া শ্রীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আরাকান রাজ বরাবরই আপনাকে সনদ্বীপের রক্ষক স্বরূপ বিবেচনা করিতেন, এক্ষণে কার্ভালো ও মাটুসের শাসন ক্ষমতা সনদ্বীপের উপর বিস্তৃতি লাভ করায়, পাছে অদূর ভবিষ্যতে পর্ত্তুগীজ শক্তি বঙ্গোপ-সাগরের কূলে মধ্যাহ্ন রবির দ্বীপ্ত তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে সে আশঙ্কায় তিনি কেদার রায় ও পর্ত্তুগীজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া সনদ্বীপ অধিকার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। আরাকান রাজের এ যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন বার্ত্তা কার্ভালো, মাটুস প্রভৃতি পর্ত্তুগীজগণেরও অজ্ঞাত রহিলনা, তাহারাও আরাকান রাজের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত যুদ্ধ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। রণ-ভেরীর ভৈরবনাদ বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে, বিক্রমপুরের শ্যাম-তটভূমে ভীষণরবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কার্ভালো বিপদ বুঝিয়া কেদার রায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। কেদার রায় তাহার প্রার্থনানুযায়ী শ্রীপুর হইতে একশতখানি কোষ নৌকা কার্ভালোর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। ওদিকে আরাকান রাজও দেড়শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রণতরী সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। তাহার এই দেড়শত রণতরীর মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র এবং কতকগুলি বৃহৎ ছিল—যে গুলি বৃহৎ ছিল সে গুলি কার্ত্তুস নামে অভিহিত হইত, এই কার্ত্তুস গুলিই কামান বন্দুক ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। পর্ত্তুগীজগণ কেদার রায়ের প্রেরিত একশত রণতরীর সহায়তায় বলীয়ান হইয়া আরাকান রাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ একশত রণতরীতে কামান বন্দুকসহ বিক্রমপুরবাসী বঙ্গবীরগণ

সনদ্বীপের যুদ্ধ।

কেদার রায়ের আদেশে আরাকান রাজের ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্য বীরদর্পে কার্ভালোর সহায়তার নিমিত্ত সনদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

১৬০২ খ্রীঃ অঃ ১০ই নভেম্বর পর্ত্তুগীজগণ ও কেদার রায়ের সৈনিকগণের সহিত মগগণের প্রথম রণক্রীড়া আরম্ভ হইল। সে দিন কার্ভালো যে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিতই বিস্ময়কর বলিতে হইবে। ৮ই নভেম্বর তারিখে মাটুসের সহিত নদীতীরবর্ত্তী ডায়েঙ্গি বন্দরে মগদের সঙ্গে সামান্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, উহাই যুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত; এই সংঘর্ষে ইমানুয়েল ডিমাটুস বহুসংখ্যক মগকে উক্ত বন্দর হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রকৃত যুদ্ধ ১০ই নভেম্বর সংঘটিত হইল। রজনীর গভীর স্তব্ধতার মধ্যে সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ গর্জ্জনসহ মগগণের সহিত পর্ত্তুগীজগণের রণলীলার কামান-ভেরীও গর্জ্জিয়া উঠিল, উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিল, সনদ্বীপের শাসনকর্ত্তা কার্ভালো মাটুসের সহিত মিলিত হইয়া মাত্র ৫০ খানি জাহাজের দ্বারা আরাকান রাজের দেড়শত রণতরীকে প্রতিহত করেন। ঐ ৫০খানা জাহাজের মধ্যে ফাস্তেজ, ৪খানা কার্ত্তুস ৩খানা বার্কেস ব্যতীত অপর সমুদয় গুলিই জেলিয়া ছিল। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপ অতি অল্প সংখ্যক রণতরীর সাহায্যেই পর্ত্তুগীজ বীরগণও বঙ্গীয় বীরগণ সমুদয় বিপদ অতিক্রম করিয়া প্রভাত হইবার পূর্ব্বে মগদিগের সমুদয় জাহাজ অধিকার করিতে সমর্থ হ'ন,—ঐ দেড়শত রণতরীর মধ্যে শুধু একখানা বার্কেস পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। পর্ত্তুগীজগণ এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া বহু তীর, বন্দুক, দ্বাদশটী কামান এবং অন্যান্য বহু যুদ্ধোপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে আরাকান রাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বহুল পরিমাণে ক্ষতি গ্রস্থ হ'ন।*

আরাকান রাজের পিতৃব্য সিনাবদী ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি ইহাতে নিহত হয়—বহু ব্যক্তি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। পর্ত্তুগীজগণ এই যুদ্ধে বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি গ্রস্থ হ'ন নাই, বরং লাভবানই হইয়াছিলেন।

এই পরাজয় বার্ত্তা চট্টগ্রাম পঁহুছিলে আরাকান রাজ ১০০০ যুদ্ধজাহাজ সহ সনদ্বীপ অধিকারে কৃত-সংকল্প হন্ এবং তাহাতে পরিশেষে সফলকামও হইয়াছিলেন।

সনদ্বীপের দ্বিতীয় যুদ্ধ।

'সেলিমসা সনদ্বীপ অধিকারের জন্য মনে মনে সংকল্প করেন, কারণ ইহাতে, তাঁহার গৌরব রক্ষা হইবে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজগণের দমনার্থে ইনি নানাপ্রকার উপায়াবলম্বনে প্রবৃত্ত হন, এবং তৎসঙ্গে বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশেও দৃষ্টিপাত করিতে বিরত হন নাই। এই সময়ে তিনি বহুল পরিমাণে সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরাকান রাজ যুদ্ধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত ১০০০ একহাজার খানি যুদ্ধ জাহাজ, ঝাণ্ডার, বৃহৎ কার্ত্তুস ও বহু কোষনৌকা সংগ্রহ করেন। কেদার রায়ও কার্ভালো কৃত পরাজয়-অপমান পরিশোধার্থ মগ নৌ-সেনাপতিগণ এই বিপুল-বাহিনী সহ সনদ্বীপ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এ বড় দুঃসময়,—ওদিকে কেদার রায় বিক্রমপুরের স্বাধীনতা রক্ষার্থে রণসাজে সজ্জিত হইতেছেন—কারণ ক্ষুধার্ত্ত-ব্যাঘ্রের ন্যায় মোগল সেনাপতি মানসিংহ বিক্রমপুরের স্বাধীনতা বৈজয়ন্তী চির নিপাতিত করিবার উদ্দেশে মোগল বাদশাহের আদেশে বাঙ্গলার দ্বার দেশে উপনীত,—তাই প্রতাপ কেদার প্রভৃতি বীরেন্দ্রগণ স্বদেশ রক্ষার্থ নিজ নিজ সৈন্য, যুদ্ধোপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য বিশেষরূপে ব্রতী, কাজেই আরাকান রাজ সুযোগ বুঝিয়া সনদ্বীপ অধিকারে অগ্রসর হইলেন। কার্ভালো একাকী,

এবার কেদার রায় আর পূর্ব্ব বারের ন্যায় সাহায্য করিতে সমর্থ নহেন, কাজেই মহাবীর কার্ভালো প্রকৃত বীরের ন্যায় শুধু মাত্র ৫০ খানি জেলিয়া, ৪ খানি কার্ত্তুস ও একখানা রণপোত সহ মগরাজার বিপুল বাহিনীর প্রতিরোধে অগ্রসর হইলেন। অন্যান্য সঙ্গীয় পর্ত্তুগীজ বীরগণ এইরূপ অসম সাহসিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শুধু মৃত্যুকে বরণ করিয়া লওয়া অপেক্ষা পৃষ্ঠ-প্রদর্শনই অধিকতর সুসঙ্গত বোধে কার্ভালোকে সাহায্য করিতে নিরস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। একা কার্ভালো সামান্য বাঙ্গালী ও পর্ত্তুগীজ সৈন্যসহ রণে প্রবৃত্ত হইলেন। কেদার রায়ের প্রেরিত অল্প সংখ্যক নৌ-সৈন্য ও কার্ভালোর সংগৃহীত মুষ্টিমেয় পর্ত্তুগীজ সৈন্য যেরূপ বীরত্বের সহিত তেজের সহিত রণ-নৈপুন্যের সহিত আরাকান রাজের সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। বেলা এগারটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশাল জলধির সুনীল বক্ষ প্রকম্পিত করতঃ যুদ্ধ চলিল! কি সে ভীষণ যুদ্ধ! অরাতি দলকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া, তাহাদের যুদ্ধ জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া অপূর্ব্ব রণ-কৌশলের সহিত কার্ভালো আরাকান রাজকে পরাজিত করিয়া যুদ্ধে বিজয় লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে প্রায় ২০০০ দুই হাজার মগ জীবন বিসর্জ্জন করে ও তাহাদের ১৩০ খানা রণপোত ভস্মীভূত হইয়া যায়। সনদ্বীপের এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করায় কার্ভালোর বীরত্ব-খ্যাতি বঙ্গের সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করে। পরাজিত মগগণ চাটিগাঁ অভিমুখে প্রস্থান করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল। আরাকান রাজ এই পরাজয় ব্যাপারে তদীয় সেনাপতিগণের প্রতি বিশেষরূপে অসন্তুষ্ট হন, কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কোন কোন সেনাপতিকে তাহাদের কাপুরুষতার জন্য স্ত্রীলোকের বেশ পরিধান করাইয়া যারপর নাই অপমানিত করিয়াছিলেন। ফিরিঙ্গীও বাঙ্গালীর

সম্মিলিত শক্তিরও রণনৈপুণ্যের পরিচয় স্বরূপ সনদ্বীপের যুদ্ধ কাহিনী ইতিহাসের বক্ষে চির-জীবিত রহিবে।

কার্ভালো এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও বিজয়-গৌরব-শান্তি তাহার লাভ করিতে হয় নাই, কারণ এই যুদ্ধে ব্যবহৃত রণতরী সমূহ বিপক্ষ সৈন্যের গোলা গুলির আঘাতে একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল, যুদ্ধোপকরণ ও একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছিল, কাজেই মগগণের পুনরাক্রমণ আশঙ্কায় তাহাকে বাধ্য হইয়াই সনদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীপুর বন্দরে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এস্থানে আসিয়া তিনি তদীয় রণতরী সমূহের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। কার্ভালো সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া যখন শ্রীপুরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সুযোগে আরাকান রাজ সনদ্বীপ অধিকার করিয়া বসিলেন। কেদার রায় সে দিকে আর দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাইলেন না কারণ সে সময়ে বিক্রমপুরের স্বাধীনতা হরণার্থ মোগল সুবেদার মানসিংহ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছেন।

কার্ভালোর বীরত্ব বার্ত্তা তৎকালে বঙ্গদেশে বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, কথিত আছে যে কার্ভালোর নামে সে সময়ে জন সাধারণ এইরূপ ভীত হইত যে একজন মগ সেনানী স্বপ্নে কার্ভালো কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন মনে করিয়া আপনার অধীনস্থ সৈন্যদিগকে জাগ্রত করিয়া এক বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—সৈন্যগণ ভীত চকিত হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ-পরিত্যাগ করিয়াছিল, আরাকানরাজ সেনাপতির এইরূপ ভীতি ব্যবহারের কথা শ্রুত হইয়া তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন।

সনদ্বীপ লইয়া এত গোলযোগের মূলকারণ এই যে মোগল-রাজ-শক্তি বিক্রমপুরকে সরকার সোণারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আপনাদের অধীন

বলিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে এবং উহার কোন কোন অংশে আপনাদের শাসন পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হয় সে সকল অংশ সমূহের মধ্যে সনদ্বীপই প্রধান। সনদ্বীপ কেদার রায়ের অধিকৃত ভূমিখণ্ড, যখন মোগলেরা উহা অন্যায় রূপে রাজ্যভুক্ত করিয়া লইল তখন কেদারের সহিত মোগলের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল, তিনিও মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং কার্ভালোর সহায়তায় মোগলের হস্ত হইতে ১৬০২ খ্রীঃ অঃ সনদ্বীপ পুনরায় অধিকার করিয়া লইলেন। এ অধিকারের জন্যই আরাকান রাজের সহিত কেদার রায় ও কার্ভালোর রণ-সংঘর্ষ ঘটে; সে কাহিনীই এ অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

——:*:——

চতুর্থ অধ্যায়।

বাঙ্গালী ও মোগলে ভীষণ যুদ্ধ।

সনদ্বীপের ভীষণ যুদ্ধ পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মোগলের সহিত বাঙ্গালীর রণ-কোলাহল দিগন্ত ব্যাপৃত হইয়া উঠিল। একে একে অন্যান্য ভৌমিকগণ মানসিংহের পদানত হইয়াছে—শুধু প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় কিছুতেই বিনাযুদ্ধে মোগলের পদানত হইতে স্বীকৃত হ'ন নাই, মানসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে প্রতাপ ও কেদার রায়কে পরাজিত করিতে না পারিলে তাঁহার বীরত্ব-গৌরব সম্পূর্ণ বৃথা। বঙ্গের কোন কোন ঐতিহাসিক প্রতাপাদিত্যকে বঙ্গের শেষবীর নামে অভিহিত করিতে চাহেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কেদার রায়ই বঙ্গের শেষবীর। জয়পুর রাজ্যের ইতিহাসানুযায়ী আমরা জানিতে পারি যে 'প্রতাপাদিত্যকে জীতকর রাজা কেদারকো রাজ্যপর চড়াই কী।'* আমরা এখানে এতর্কের আর বিশেষ আলোচনা না করিয়া কেদার রায়ের সহিত মোগলের যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

মানসিংহ কেবল যে বীর ছিলেন তাহা নহে—তিনি অত্যন্ত কৌশলীও ছিলেন,—নরাধম বাঙ্গালী কুলাঙ্গার ভবানন্দের সহায়তায় মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সেনাপতি মন্দারায়কে কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন।

---

* ইতিহাস রাজস্থান—শ্রীরামনাথ বারেট।

মন্দারায় বীরপুরুষ বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সুবেদারের আদেশ ক্রমে একশত রণতরী ও একদল সাহসী ও নির্ভীক মোগল সৈন্য সহ শ্রীপুরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মানসিংহের

কেদাররায়ের মোগলের সহিত প্রথম যুদ্ধ।

প্রেরিত এই রণতরী সমূহ কেদার রায়ের গর্ব্ব এবং বিক্রমপুরের স্বাধীনতা হরণ করিবার উদ্দেশে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত পতাকা উড়াইয়া "আল্লাহো আক্‌বর" রবে পদ্মার উভয় তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, বীরদর্পে মেঘনার উপকূলে উপনীত হইল। কেদার রায় পূর্ব্ব হইতেই গুপ্তচর প্রমুখাৎ সমুদায় সংবাদ অবগত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে মন্দারায়ের আগমন বার্ত্তায় বীরের ন্যায় তাহার গতি-রোধার্থে সসৈন্যে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইলেন। বলা বাহুল্য যে কার্ভালো এই যুদ্ধে কেদার রায়ের সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁহার উপরেই নৌ-সৈন্য পরিচালনার ভার অর্পিত ছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গী সৈন্যগণের সহিত মন্দারায়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মেঘনার কৃষ্ণ বারিরাশি লোহিত বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া উঠিল, ভীষণ-বেগে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গীর সমবেত শক্তির নিকট মোগল সৈন্যগণ কিছুতেই যুঝিতে পারিল না, কামান-ভেরীর প্রলয় গর্জ্জনে, বঙ্গবীরগণের অলৌকিক বীরত্ব প্রভাবে মোগল সেনাপতি মন্দারায় পরাজিত ও নিহত হইলেন, মোগল সৈন্যগণ অধিকাংশই নিহত হইল, অল্প সংখ্যক যাহারা জীবিত ছিল তাহারা কোনরূপে পলায়ন করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইল। *

---

* পার্কাস তদীয় গ্রন্থমধ্যে এই যুদ্ধের বিবরণ বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মেঘনার উপকূলে যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল উহাও তাহার গ্রন্থ পাঠেই জানিতে পারি। ডাক্তার ওয়াইজ পার্কাসের লিখিত বিবরণ প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরাও পাঠকবর্গের সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ এস্থানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম যথা :— 'when Bengal was conquered by the Mughuls', they took possession

এই পরাজয় সংবাদ মানসিংহের শ্রুতিগোচর হইলে, তিনি যারপর নাই বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, বাঙ্গালী বীরগণ যে সুশিক্ষিত মোগল সৈন্যগণকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পরাজিত করিয়া সেনাপতিকে নিহত করিতে সমর্থ হইবে তাহা তাঁহার কল্পনায়ও আইসে নাই। মন্দারায়ের এই পরাজয় ব্যাপারের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বয়ং বিক্রমপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এবার বহু সৈন্য এবং সুদক্ষ সেনাপতিবৃন্দ তাহার সহচর হইল। এই যুদ্ধের বিবরণ জয়পুর ভাষায় লিখিত 'বংশাবলী' নামক হস্ত লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অবিকল উদ্ধৃত করা হইল।

কেদার রায়ের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ।

ঐ গ্রন্থে মানসিংহের পূর্ব্বাঞ্চল—বিজয় বৃত্তান্ত যেরূপ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এস্থানেও তাহাই অনুস্থত হইল। 'বংশাবলী' গ্রন্থে এইরূপে লিখিত আছে।—"পাছে উঠীনে কেদার কায়ত কো রাজ ছো। সো রাজা বাজৈ ছো। সো উকৈ সিলামাতা ছী॥ সো মাতা কা প্রতাপ সে উনে কৈ ভীজীৎ তো নহী। সো মানসিংঘজী পুছী—ইসো কাঁইকো বল ছৈ। সো অরজ করী সো সীলামাতা কো বল ছে। জদি আপ মাতা নৈ প্রসন্ন হোবা

of the island, but Cadaray [Kedar Rai of Sripur] still claimed it as his rightful property. The Portuguese captured it ; but this roused the anger of the King of Arakan, who sent a fleet to drive the Portuguese out, and Cadaray (Kedar Rai) which ; they say, was true Lord of it, sent one hundred Cossi (Koshas) from sripur to help him. The combined fleet was defeated, and the Portuguese entered into a treaty with Kedar Rai, Carvallius, the leader of the Portuguese took his disabled vessels to Sripur to right them. Then he was attacked by one hundred Koshas under command of 'Mendary' a man famous in these parts. The Mughul fleet was defeated and its admiral 'Mandary Killed. (Purchas's Pilgrims. Part IV, Book V Page 513).

বাস্‌তে হোম ঔগরৈছ করায়ো জদি মাতা প্রসন্ন হুই ; অর কেদার রাজা স্হুঁ মাতাকো যো বচন ছো—সো তূ রাজী হোয় কহসী সো তূজা—জদি জাস্য। বেটীকো স্বরূপ করি দেবী পূজন মেঁ আয় বৈঠী। জদি রাজা আপকী বেটী জানী॥ অর কহী তূজা—মুনে পূজন করবা দে। তূজা ঈয়াঁ তীনবার কহী। জদিমাতা বোলী থারী মহা কো বচন পূরো হো চুক্যো ছৈ। জদি রাজা কহী মুনৈ ছাল লীয়ো আপকী মরজী হোয় সো কীজে। জদি মাতা নৈ সমুদ্র মেঁ নাষি দীনী। জদি রাজা মান্‌সিংঘজী কো দেবী আরাজ দীনা—সো সমুদ্রমেঁ নাষি দীনা ছৈ। সো উঁঠা স্হুঁ কাট লীজ্যো সেহ তোস্হুঁ প্রসন্ন হুবা। জদি রাজা মানসিংঘজী কেদার রাজা নে দবাব দীয়ো জদি রাজা তো জাজি মেঁ বৈঠ ভাজ্যো। অর দীবাণ নেঁ মানসিংঘজী কোঠৈ ভেজ্যো সো দীবাণ আপ মিল্যো। জদি রাজা মানসিংঘজী উঁকী বেটী মাঁগী। জদি রাজা কেদার দেনী করী॥ অর মিলাপ হুবো। জদি নীজর করী॥ জদি আপ ফুরমাই সো থারো রাজ ছৈ মো তোনে দীনূ। জদি সলাম করি পাছে সমুদ্র মেঁ মাতা ছী জীঠাব স্হুঁ কাটিলীনী। অর অরজকরী মাতা অপফুরমাবোজী মাঁফক পূজন করুঁ। জদি মাতা কহী—মাহারৈ বলদান নিতি হুবা জাসী জীতেঁ থারো রাজবণ্যো রহসী। অর মেঁডী রহস্যোঁ। জী দিন বলদান-রোজীনা হোতো রহজাসী জীঁদিন থারো মহারো বচন পূরোহোসী॥ জদি আপ কবুল করী। অর মাতা নেঁলে আয়া। অর বংগাল্যা নেঁ পূজন সোঁপো অর উঠা স্হুঁ কূঁচ করি আয়া।"

এদিকে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল, তিনি রাজা নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রভাবে তাঁহাকে (কেদার রায়কে) কেহই জয় করিতে পারিতনা। এজন্য মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহার এত প্রতাপের কারণ কি? নিবেদন করা

হইল, 'ইহার প্রতাপের হেতু শিলামাতা।' ইহা শুনিয়া মাতাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত রাজা মানসিংহ হোম প্রভৃতি করাইলেন, তাহাতে মাতা প্রসন্ন হইলেন, কেদার রায়ের সহিত মাতার এই অঙ্গীকার ছিল যে, তুমি যখন নিজ হইতে বলিবে 'তুই যা' তখনি যাইব। একদিন রাজা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার এক কন্যার রূপ ধারণ করিয়া দেবী পূজাস্থানে আসিয়া বসিলেন। রাজা তাঁহাকে আপন কন্যা জ্ঞানে বলিলেন "তুই যা, আমাকে পূজা করিতে দে, তুই যা।" এইরূপ তিনবার বলিলে মাতা বলিলেন "তোমার ও আমার মধ্যে যে অঙ্গীকার ছিল, তাহা পূর্ণ হইল। তখন রাজা বলিলেন, "আমাকে আপনি ছলনা করিলেন, আপনার যাহা অভিরুচি করুন।" পরে মাতাকে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেবী মানসিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আমাকে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখান হইতে আমাকে উঠাইয়া লও, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।' ইহার পর রাজা মানসিংহ কেদার-রাজাকে হারাইয়াছিলেন,রাজা জাহাজে করিয়া পলাইলেন এবং দেওয়ানকে মানসিংহের নিকট পাঠাইলেন, দেওয়ান মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর মানসিংহ রাজা কেদারের কন্যা প্রার্থনা করিলেন। রাজা দিতে অঙ্গীকার করায় উভয়ের মিলন হইয়া গেল এবং কেদার রাজা মানসিংহকে নজর করিলেন। মানসিংহ কহিলেন তোমার রাজ্য তোমায় দিলাম। কেদার রাজা সেলাম করিলেন। পরে মানসিংহ সমুদ্র হইতে মাতাকে উঠাইলেন এবং নিবেদন করিলেন 'মাতা আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সেই মত আপনার পূজা করিব।' তখন মাতা কহিলেন, যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আমার নিকট বলিদান হইতে থাকিবে, ততদিন তোমার রাজ্য অটল থাকিবে। আর আমিও থাকিব। যে দিন হইতে নিত্য বলিদান বন্ধ হইবে, সেইদিন তোমার সহিত আমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে।' রাজা

ইহাই স্বীকার করিলেন এবং মাতাকে লইয়া আসিলেন এবং বাঙ্গালী দিগকে ইহার পূজার ভার সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, তথা হইতে কুচ করিয়া যাত্রা করিলেন।' †

জয়পুর রাজবংশের বংশাবলী গ্রন্থ ব্যতীত 'চারণ বংশোদ্ভূত' শ্রীযুক্ত রামনাথ বারেট মহাশয়ের কৃত 'ইতিহাস রাজস্থান' নামক গ্রন্থেও এ যুদ্ধের বিবরণ নিম্নলিখিত রূপে লিখিত আছে, যথা ঃ—'প্রতাপাদিত্যকো জীতকর রাজা কেদারকো রাজ্যপর চড়াই কী। বহ (ইনি) জাতিকা কায়স্থ থা, ঔর সল্লামাতা নামী দেবী কউস্‌কে ইঅথা ; মানসিংহজী কী লঢ়াইকে সমাচার স্থনকর কেদার নৌকামে বৈঠকর সমুদ্র কী ঔর (অভিমুখে, দিকে) ভগ্‌গয়া। ঔর মন্ত্রীসে কহ্ গয়া কি যদি হোস্‌কে তো মেরী পুত্রী মানসিংহজীকো দে কর সন্ধি করলে না, মন্ত্রীনে ঐসা হী কিয়া মানসিংহজীনে প্রসন্ন হো কর কেদার কো বাদশাহকা পাদসেবী বনাকর উস্‌কা রাজ্য পীছা দে দিয়া, ঔর সল্লাদেবীকো অম্বের লে আয়ে।” 'বংশাবলী' ও ইতিহাস রাজস্থান গ্রন্থ যে অপ্রামাণিক তাহা নহে। কেদার রায়—মানসিংহের সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধে যে পরাজিত হইয়াছিলেন তাহাও প্রকৃত, কারণ পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে কেদার রায়ের সহিত মহারাজা মানসিংহের যে চারিবার যুদ্ধ হইয়াছিল সে উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। একটা বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইতেছে তাহা কেদার রায়ের কন্যা-ঘটিত ব্যাপার। আমাদের সংগৃহীত বংশাবলী সমূহে কেদার রায়ের একমাত্র পুত্র রূপনারায়ণ রায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন কন্যার উল্লেখ নাই। ঈশাখাঁর সোণামণি অপহরণ ঘটিত কাহিনী যেমন পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত, যদি কেদার রায়ের কোন কন্যা মহারাজা মানসিংহ বিবাহ করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই

* শ্রীযুক্ত নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্য ৫০৮—১০ পৃষ্ঠা।

তৎসম্পর্কিত কোনও জন-প্রবাদ অদ্যাপি বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত থাকিত। আমরা প্রাচীন ইতিহাসানুশীলন করিতে যাইয়া দেখিতে পাইতেছি যে বহু ঐতিহাসিক সত্যই বংশাপরম্পরানুগত জনপ্রবাদের মুখে মুখে বহুকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, অবশ্য সে সকলের মধ্যে অনেক স্থলেই বহু পরিমাণ অতিরঞ্জন রহে, তথাপি সে সমুদয় সম্পূর্ণরূপে অসত্য বলিয়া কোন দিনই সপ্রমাণ হয় না। নিজ নিজ বংশাবলীতে মানসিংহের ন্যায় বীরের বিষয়ে যে একেবারে কোনরূপ অতিরঞ্জন নাই তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতীতি হয় না, অতএব মানসিংহ কেদার রায়কে পরাজয় করিয়া তাহার কন্যা বিবাহ করতঃ বৈবাহিক সম্বন্ধ গুণে কৃপা করতঃ শ্বশুর মহাশয়কে রাজ্য প্রত্যার্পণ করিয়া সুবোধ বালকের ন্যায় স্বীয় রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন—কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তিই নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে তাহা বিশ্বাস করিবেননা। আমরা কিংবদন্তী হইতে জানিতে পারি যে মানসিংহ দ্বিতীয়বার বিক্রমপুর আক্রমণ করিলে কেদার রায়ের সহিত ভীষণ যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে কেদার রায় পরাজিত হইয়া সপরিবারে সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করেন, মানসিংহ কোনরূপে কেদার রায়কে বন্দী করিতে না পারায় তদীয় মন্ত্রীর সহায়তায় সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত করেন এবং তদীয় বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ বিজিত রাজ্য পুনরায় কেদার রায়কে সমর্পণ পূর্ব্বক তাহাকে মোগলের ন্যায্য কর প্রদানে বাধ্য করিয়া প্রস্থান করেন। ইহাই বিশ্বাস্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, নচেৎ কেদার রায়ের ন্যায় একজন বীর, যিনি কোনরূপেই মোগলের কৃপা ভিক্ষা করেন নাই, তাঁহার পক্ষে স্বীয় কন্যাদানে মহারাজা মানসিংহের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া কখনও বিশ্বাস যোগ্য কিংবা সম্ভবপর নহে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মহারাজ মানসিংহ দ্বিতীয়বার কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিলে, তাহার অদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকেই আবার স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া

গিয়াছিলেন। মানসিংহের এইরূপ উদারতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিরল নহে। কেদার রায়ের কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়া মানসিংহ সন্ধি করিয়াছিলেন ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, কাজেই বংশাবলীর লিখিত এ উক্তি আমরা সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

মানসিংহ কেদারকে 'বাদশাহকা পাদসেবী' করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মোগলের সহিত তৃতীয় বারের যুদ্ধ।

কিন্তু বন্য সিংহ কি সহজে কাহারো বশ্যতা স্বীকার করে? এক্ষেত্রে ও তাহাই হইল, কেদার মোগলের 'পাদসেবী' হওয়া অপেক্ষা জীবন-বিসর্জ্জন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবস অতি-বাহিত হইল, কেদার মোগল-দরবারে কর পাঠাইলেন না। তাগিদ আসিল কেদার রায় তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। দূত ভীতি প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেল, মানসিংহের-ভীষণ ক্রোধের কথা জ্ঞাপন করিল, কেদার রায় তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ মানসিংহ ক্ষীণ বাঙ্গালীর এতদূর আস্পর্দ্ধা নীরবে সহ্য করিলেন না, সেনাপতি কিলমক কে বিপুল মোগল-বাহিনী সহ শ্রীপুরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। কেদার রায় ও অপ্রস্তুত ছিলেন না, মানসিংহ যে এ অপমান নীরবে সহ্য করিবেন না তাহা তিনি বিশেষরূপেই জ্ঞাত ছিলেন। সর্ব্বত্র দূত প্রেরিত হইল, বিক্রমপুরের প্রত্যেক পুরুষ ও রমণী স্বদেশের এ দুর্দ্দিনে জন্মভূমির স্বাধীনতা সংরক্ষণার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেদার রায় বিক্রমপুরবাসী স্বদেশভক্ত বীরগণ, কার্ভালো ও পর্ত্তুগীজ সৈন্যগণ সহ মোগলের আক্রমণ প্রতিরোধার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

সেনাপতি কিলমক সসৈন্যে শ্রীপুরের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত

শ্রীনগরের যুদ্ধ-কিলমক্ বন্দী।

হইলেন। কিলমক সর্ব্বাগ্রে শ্রীপুর আক্রমণ করিতে সাহসী না হইয়া প্রথমে কেদার রায়ের অধিকারভুক্ত বিক্রমপুরস্থ শ্রীনগর নামক সমৃদ্ধি-শালী নগরের সন্নিকটে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া

গেল। কামানের গর্জ্জনে ও সৈন্যের হুঙ্কারে শ্যাম-সলিলা কালীগঙ্গার বক্ষ প্রতিধ্বনিত করতঃ কেদার রায় অতিশয় বীরত্বের ও সাহসিকতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মোগল ও রাজপুত প্রমাদ গণিল, তাহারা কোনরূপেই বাঙ্গালীর অসীম বীরত্বের নিকট তিষ্ঠিতে সক্ষম হইল না, দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের মায়া সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়া বঙ্গবীরগণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, মোগলের কামান-ভেরী, তাহাদের বৃথা অস্ফালন সমুদয়ই ব্যর্থ হইল, পলায়নপর রাজপুত ও মোগল সৈন্যগণকে কেদার রায়ের সৈন্যগণ চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিয়া ফেলিল। মোগল সেনাপতি কিলমকের গর্ব্ব ব্যর্থ হইল, তিনি বন্দী হইলেন। কেদার রায় কিলমককে সসৈন্যে শ্রীনগরে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

মানসিংহের শ্রীপুর আগমন ও মোগলের সহিত কেদারের চতুর্থবার যুদ্ধ।

মানসিংহ কিলমকের দুরবস্থার কাহিনী জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং বিপুল মোগল-বাহিনী সহ শ্রীপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী স্থল ও জলযুদ্ধে সুনিপুণ আরাকান রাজকে ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া মানসিংহ ভাবিয়াছিলেন যে বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়কে পরাজিত করিতেও তাঁহার তাদৃশ বেগ পাইতে হইবে না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ কেদার রায়ের নিকট পরাজিত হইয়া তাহার সেই অন্ধ বিশ্বাস দূর হইল, কাজেই এবার কেদার রায়ের ধৃষ্টতার সমুচিত ফল দেওয়ার জন্য বিপুল সৈন্য সহ মানসিংহ বিক্রমপুরের প্রান্ত ভাগে আসিয়া উপনীত হইলেন। কথিত আছে যে গর্ব্বিত মানসিংহ শিবির সন্নিবেশিত করিয়া কেদার রায়ের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন, দূতের সহিত একখানি তরবারি ও শৃঙ্খল প্রদান করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে যদি কেদার রায় শৃঙ্খল গ্রহণ করতঃ বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করেন ভালই, তাহা হইলে তদ্বিরুদ্ধে আর কোনরূপ অস্ত্র ধারণ করা হইবে না,

আর যদি তিনি তরবারি গ্রহণ করেন তাহা হইলে শীঘ্রই মোগল-বাহিনী তাঁহার উচ্ছেদ-সাধনে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে। ঐ দূত সঙ্গে মানসিংহ নিম্নলিখিতরূপ লিপি প্রেরণ করেন,—

'ত্রিপুর মঘ-বাঙ্গালী-কাক-কুলী-চাকুলী।
সকল পুরুষমেতৎ ভাগ যাও পলায়ী॥
হয়-গজ-নর-নৌকা-কম্পিত বঙ্গভূমিঃ
বিষম সমরসিংহো মানসিংহঃ প্রয়াতি॥

কেদার রায় মানসিংহ প্রেরিত এই পত্র, তরবারি ও শৃঙ্খল দেখিতে পাইয়া ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন এবং ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য পত্রনবীশ (মুন্সী) বৈদ্যবংশীয় বিশ্বনাথ সেনের প্রতি ভার প্রদান করিলেন। বিশ্বনাথ পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি মানসিংহের লিখিত পত্রের নিম্নলিখিতরূপ উত্তর লিখিলেন।

'ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তিবেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥' *

---

* গোপাল কৃষ্ণ কবীন্দ্র কৃত 'অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা' নামক গ্রন্থে বিশ্বনাথ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে,—

চাঁদরায় কেদার রায় বিক্রমপুর শাসক।
বুয়ীবংশী বিশ্বনাথ তৎ পত্র লেখক॥

বিশ্বনাথ সেনের বংশধরগণ অদ্যাপি বিক্রমপুরস্থ মধ্যপাড়া গ্রামে বাস করিতেছেন। বিশ্বনাথ পত্রনবিশের খনিত বিশাল দীর্ঘিকা ইত্যাদি অদ্যাপি উক্ত গ্রামে বর্ত্তমান রহিয়া তাঁহার কীর্ত্তি-গরিমা প্রকাশ করিতেছে। কিংবদন্তী এইরূপ যে বিশ্বনাথের খনিত দীর্ঘিকা কেদার রায়ের খনিত দীঘিকা ইত্যাদি হইতে বৃহৎ হইয়াছে এ সংবাদ শুনিয়া রায় ভ্রাতৃদ্বয় তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, বিশ্বনাথ প্রভুর অসন্তুষ্টি নিবারণার্থ স্বীয় দীঘির কিয়দংশ ভরাট করিয়া প্রভুর মনোরঞ্জন করেন। মধ্যপাড়া গ্রামে এখনও এই বিশাল দীর্ঘিকার খাত বিদ্যমান আছে। মানসিংহও কেদার রায়ের মধ্যে লিখিত এই শ্লোক

এই পত্র প্রেরণ সময়ে কেদার রায় দূতকে বলিলেন যে 'তোমার প্রভুকে বলিও' আমি তাঁহার প্রেরিত তরবারি গ্রহণ করিলাম, তাঁহার যতদূর ক্ষমতা তিনি যেন তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত না হ'ন। হয় তাঁহার অস্ত্রাঘাতে আমার মস্তক দেহচ্যুত হইবে নচেৎ আমার অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হইবে।" দূতের মুখে এবং কেদার রায়ের লিখিত পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া মানসিংহ বিশেষ রূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং ভীষণ বেগে কেদার রায়ের রাজধানী আক্রমণ করিলেন।

কেদার রায় বুঝিয়াছিলেন যে এবার তাঁহার রক্ষা নাই, যদি জয় লাভ করিতে পারেন ভালই, নচেৎ তাঁহাকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। যে দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণার্থ এতদিন প্রাণপণ করিয়া যুঝিয়া আসিয়াছেন—কাপুরুষের ন্যায় সে দেশ রক্ষার জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন না করা কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া বীরেন্দ্র কেদার বঙ্গীয় সৈন্যগণ সহ ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষের কামানও ভেরী বিক্রমপুরের বক্ষ প্রকম্পিত করতঃ আবার ভীষণ শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত বঙ্গ-সৈন্যগণ প্রবলবেগে মোগল সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হইল না, সপ্তদিবসব্যাপী ভীষণযুদ্ধের পর মোগল সেনাপতি মানসিংহ বিজয় লাভ করিলেন। বিক্রমপুরের স্বাধীনতা-সূর্য্য চির অস্তমিত হইল। কেদার রায় আহত ও বন্দী হইয়া মানসিংহের নিকট নীত হইবার অল্পকাল পরেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। মৃত্যু আসিয়া বীরন্দ্র কেদারকে মোগলের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া দিল। এই যুদ্ধের সময়

দু'টী বিক্রমপুরবাসী বহু প্রাচীনের মুখে বাল্যকালে শু'নয়াছিলাম, তখন ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই এই শ্লোক দু'টী ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের দ্বারাই সর্ব্বাগ্রে বঙ্গসাহিত্যে প্রচারিত হয়,—এজন্য বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট চির ঋণী থাকিবে।

কেদার রায় পাঁচশত রণতরী এবং বহু পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ও পর্ত্তুগীজ সেনাগণ সেই সমস্ত রণতরীতে কামান ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র উপযুক্তরূপ সংস্থান করিয়া মোগলের গতিরোধার্থ বিশেষরূপে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু অগণন মোগল সৈন্যের প্রবল আক্রমণের নিকট কোন ফলই ফলিল না। কালীগঙ্গার বিশাল বক্ষ রুধিরে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল, মোগলের সহিত কেদার রায়ের জলযুদ্ধ এবং স্থলযুদ্ধ—উভয় প্রকার রণলীলাই সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীনগর নামক স্থানে এইযুদ্ধ সংঘটিত হয়, মানসিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ঐ স্থানের নাম ফতেজঙ্গপুর রাখেন। এখনও সেই ফতেজঙ্গপুর বিদ্যমান আছে, শ্রীনগরও আছে—কিন্তু তাহার সে শ্রী নাই, সেই ঐশ্বর্য্য নাই, সেই সমৃদ্ধি নাই, শুধু কঙ্কাল-সার দেহে অতীতের স্মৃতি বক্ষে করিয়া 'নগর' নামে ক্ষুদ্র গ্রাম এখনও দক্ষিণ বিক্রমপুরে বিরাজিত। কিলমক এই নগরেই এক সময়ে বন্দী হইয়াছিলেন। 'আক্‌বর নামা'তে এই যুদ্ধের বিবরণ যেরূপ লিখিত আছে আমরা এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম 'Raja Mansingh * * * turned his attention towards Kaid Rai of Bengal who has collected nearly 500 vessels of war and had laid seige to kilmak the Imperial commander in Srinagar. Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally over came the enemy and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner who died of his wounds soon after he was brought before the Raja. † কেদার রায়েরমৃত্যু

* Elliot's History of India, Vol. VI. P. III.

† বারভূঞা—দ্বাদশ অধ্যায় ১০৭ পৃষ্ঠা।

সম্পর্কে দেশীয় জন-প্রবাদ এই যে 'মানসিংহের নিকট দূত প্রেরণের অব্যবহিত পরেই কেদার রায় স্বীয় ইষ্টদেবীর অর্চ্চনা জন্য দশমহাবিদ্যার মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন এমন সময় মানসিংহ কর্তৃক প্রেরিত এক গুপ্তঘাতক সহসা দেবী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্যান নিমগ্ন মহাবীর কেদার রায়কে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। অনেকে অনুমান করেন গৃহশত্রু বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত খাঁ এই বিষয়ের প্রধান সহায়কারী ছিল। আরও প্রবাদ এইরূপ যে কেদার রায়ের ছিন্নমুণ্ড ভূপতিত হইয়াও 'ছিন্নমস্তে নমস্তে' এই ইষ্টনাম উচ্চারণ করিয়াছিল।' এ কাল্পনিক বাক্যের সহিত যে ঐতিহাসিক সত্যের কোনও ঐক্য নাই তাহা 'আক্‌বর নামা' হইতে উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ডুজারিক এই যুদ্ধ সম্পর্কে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন আমরা তাহা অনুসরণ করিয়াই এই যুদ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই যুদ্ধে আর একজন মহাপুরুষ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার নাম মধুরায়। মধুরায় স্বকীয় বীরত্বের জন্য মুকুট রায় নামে অভিহিত হইতেন, সেকালে এইরূপ মুকুট রায় উপাধি বিশেষ গৌরব-ব্যঞ্জক ছিল। বিক্রমপুরে অদ্যাপি মধুমুকুট রায়ের প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুটরায় যে স্থানে স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন তাহা এখনও মুকুট পুর (মটুক পুর) নামে কথিত হইয়া আসিতেছে, তাঁহার খনিত দীর্ঘিকা সমূহ এবং প্রায় ৮০ আশীহাত প্রশস্ত পদ্মাতীর পর্য্যন্ত রাস্তা বিদ্যমান থাকিয়া মুকুটপুরের দীঘিও দরজা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বিক্রমপুরস্থ (উত্তর বিক্রমপুর) শ্রীপুর ও রাউতভোগ গ্রামের প্রান্তভাগে যে সুরক্ষিত দেউল বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় উহাই তাঁহার বাটীর অন্তঃপুর ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ

মধুমুকুট রায়।

বাটীর চতুর্দ্দিকে যে বিস্তৃত গড় খনিত হইয়াছিল উহা এখনও দেউলবাড়ী নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। এই দেউলবাড়ীর পূর্ব্বোত্তর দিকে যে দু'টি অব্যবহার্য্য দীঘি আছে, তাহাতে সময় সময় কারুকার্য্য বিশিষ্ট চৌকাট, কবাট ও অন্যান্য অনেক প্রাচীন জিনিষ পাওয়া যায়। মধুরায়ের নিজের কোনও বংশধর জীবিত নাই, তবে তাঁহার জ্ঞাতি ও দেওয়ান শ্রীপতি রায়ের অধস্তন দশম পুরুষ রাউতভোগ গ্রামে 'দে সরকার' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। এই শ্রীপতি রায়ের তৃতীয় পুরুষ শ্রীরূপ রায় নবাবের কর্ম্মচারী ছিলেন এবং বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হন ইহাঁরা বহুদিন হইতেই রাউতভোগ গ্রামবাসী। মধুরায়ের বাড়ীর দ্বার-পণ্ডিত যোগেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বংশধরগণ অদ্যাপি জীবিত আছেন। এই মধুরায়ের সহিত মোগল সেনাপতি মন্দারায়ের কোনও সম্বন্ধ নাই। উভয়ে পৃথক ব্যক্তি। মধুরায়ের বিষয় উত্তর বিক্রমপুরবাসী অনেকেই বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন, কেদাররায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া ইনি যে মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হ'ন সে জন প্রবাদ বিক্রমপুরবাসী অনেকেই জ্ঞাত আছেন। এ মধুমুকুট রায়ের সহিত বর্দ্ধমান জেলার জাহাঙ্গীরাবাদ পরগণাভুক্ত পূর্ব্বস্থলী গ্রাম-নিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ মুকুটরায়, যশোহরের মুকুটরায় কিংবা চট্টগ্রামের মুকুটরায়ের কোনও সংস্রব নাই। মধুরায়ের বীরত্ব কাহিনী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'প্রতাপাদিত্য' নামক গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এখানে কার্ভালোর বিষয় একটু বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিব।

কার্ভালো।

এই বিদেশী বীরপুরুষ কেদার রায়ের অধীনে সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া যেরূপ বিশ্বস্ততা ও নির্ভীকতার সহিত রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা বস্তুতঃই গৌরবের বিষয়। কার্ভালো সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আকিলে কেদার

রায় তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানসিংহ কেদার রায়ের বিরুদ্ধে নৌবাহিনী প্রেরণ করিলে, কার্ভালো সে সমুদয় রণতরী ও নৌ সৈন্যগণকে অসীম বীরত্বের সহিত আক্রমণ করিয়া একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। 'কার্ভালো এই যুদ্ধে একটী তীরবিদ্ধ হইয়া আহত হন। কয়েক দিবস পরে আরোগ্যলাভ করিয়া শ্রীপুর হইতে গোলি বা গুলু (সম্ভবতঃ হুগলী) নামক পর্টুগীজদিগের উপনিবেশে গমন করেন। উহা ক্ষুদ্র বন্দর নামে অভিহিত হইত। নদীর মুখ হইতে ৫০ লগি বা ৭৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কার্ভালো পুনর্ব্বার মগদিগকে আক্রমণ করিয়া সনদ্বীপ অধিকারের ইচ্ছা করেন। গুলোবন্দরে মোগলেরা পর্টুগীজদিগের প্রতি নূতন কর স্থাপনের ইচ্ছুক হয়, তথায় পাঁচ হাজার পর্টুগীজ অবস্থিতি করিত। মোগলেরা তথায় নদীতীরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, উক্ত দুর্গে ৪০০ সেনা অবস্থিতি করিত, ইহারা দেশীয় খৃষ্টানদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিত।'

'কার্ভালো তাঁহার ৩০ খানি জেলিয়ার সহিত তাহাদের দুর্গের নিকট দিয়া গমন কালে তাহারা প্রতি বল প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক হয়। কার্ভালো তাহাদের দাম্ভিকতা অসহ্য বোধ করিয়া ৮০ জন পর্টুগীজ সেনার সহিত তাহাদের দুর্গের সম্মুখভাগ অবরোধ করেন। আর কতকগুলি সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের প্রতি অগ্নি বর্ষণ আরম্ভ করে। উক্ত ৪০০ সৈন্যের মধ্যে মাত্র একজন কোনরূপে জীবন রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপে কার্ভালোর খ্যাতি বঙ্গরাজ্যের সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। কার্ভালোর একান্ত ইচ্ছা ছিল পুনরায় সনদ্বীপ অধিকার করেন, সেজন্য গুলবন্দর অধিকার করিয়া তথায় তাহার জাহাজ ইত্যাদির সংস্কার করিতে ছিলেন। মানুষের সকল আশাই কি আর সফল হয়? কার্ভালোর এ আশা ব্যর্থ হইল, আরাকানাধিপতি তাঁহাকে সনদ্বীপ হইতে বিতাড়িত

করিলে প্রতাপাদিত্য আরাকান রাজের আক্রমণ হইতে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিবার উদ্দেশে,মগরাজার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য কার্ভালোকে ধৃত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কার্ভালো যখন বিতাড়িত সন্ত্রস্ত এবং আশ্রয়-হীন এরূপ সময়ে চ্যাণ্ডিকানের অধিপতির (প্রতাপাদিত্য) দূত স্তোক-বাক্যে তাহাকে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল এবং বিবিধ উৎসাহ-পূর্ণ আশ্বাসের বাক্যদ্বারা প্রলুব্ধ করিল। কার্ভালো কেদার রায়ের নিকট যেরূপ মহত্ত্ব পাইয়াছিলেন এস্থলেও সেরূপ পাইবেন আশায় বিনা-তর্কে সানন্দ চিত্তে যশোহরে আগমন করেন। কার্ভালো ভাবিয়াছিলেন যে যদি তিনি চ্যাণ্ডিকানাধিপতির সাহায্য পান তাহা হইলে অনায়াসেই আরাকান রাজের প্রতি প্রতিশোধ লইতে পারিবেন। এইরূপে ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন কল্পনা করিয়া কার্ভালো তিনখানা সুসজ্জিত রণতরী, পঞ্চাশখানি জেলিয়া ও একজন সৈন্য সহ রাজ-দরবারে উপস্থিত হ'ন। প্রতাপাদিত্য তাহাকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং একটী স্বর্ণ-খচিত পরিচ্ছদ ও মূল্যবান অস্ত্রাদি প্রদান করেন। কার্ভালোকে তিনি আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত গোলযোগ শান্তির জন্য আরাকান রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিবেন। ফলে কিন্তু তাহা হইল না। চ্যাণ্ডিকান-রাজ গোপন ভাবে আরাকানাধিপতির সহিত মিলিত হইয়া কার্ভালোকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ গুপ্ত পরামর্শ কার্ভালোরও অজ্ঞাত রহিল না। অন্যান্য পর্ত্তুগীজগণ এবং পাদ্রীরা কার্ভালোকে সতর্কভাবে স্থানান্তরে অবস্থান করিবার উপদেশ দিলেন, কার্ভালো কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ন্যায় একজন বীর পুরুষের নিকট হইতে এতাদৃশ নীচতা ও অসদ্ব্যবহারের প্রত্যাশা করেন নাই, কাজেই সকলের সতর্ক করা সত্ত্বেও তিনি পূর্ব্ববৎ নিঃশঙ্ক চিত্তে রাজ-দরবারে গমনাগমন

করিতে লাগিলেন। রাজার কোন কোন সেনানায়ককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ রাজ-দরবারে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু ক্রমাগত তথায় তিন দিন রাজার সক্ষাৎ পান নাই। পরিশেষে এ নীচ ষড়যন্ত্র আর গুপ্ত রহিল না। কার্ভালোকে ধৃত করিবার ব্যবস্থা করা হইল এবং তাহাকে আহ্বান করা হইল। কার্ভালো নির্ভীক-চিত্তে প্রকৃত বীরের ন্যায় কয়েক জন পর্ত্তুগীজের সহিত পশ্চাদ্‌দ্বার দিয়া রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। প্রবেশ করা মাত্রই তাহাদিগকে রুদ্ধ করা হইল এবং পশ্চাৎ হইতে কতকগুলি লোক আসিয়া কার্ভালো এবং তাঁহার সঙ্গীয় পর্ত্তুগীজদিগকে ধৃত এবং অস্ত্র ও পরিচ্ছদ ইত্যাদি গ্রহণ করিল। অত্যাচার ও অপমানের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদিগের পদে শৃঙ্খল প্রদান করা হইল এবং রাজ সেনাপতি হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে লইয়া যাইয়া কারাগারে নিবদ্ধ করিলেন এবং সেখানেই এই নির্দ্দোষ বিদেশী বীরের হত্যা কার্য্য সম্পন্ন করেন! * কার্ভালোর হত্যার বিবরণ মধ্য-রজনীতে সাগরদ্বীপবাসী পর্ত্তুগীজগণ জানিতে পারেন। তাঁহারা এই দুঃসংবাদে একেবারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়েন। কেহ কেহ কার্ভোলোর জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পলায়ন করেন। কেহ কেহ কার্ভালোর এই শোচনীয় হত্যা-ব্যাপারের প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্যোগী হ'ন। পাদরীদিগের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহাদিগকেও যশোহর রাজ্য পরিত্যাগ করিবার আদেশ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গির্জ্জা ও ভূমিসাৎ করা হয়। কার্ভালোর এই হত্যা ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া বেভারিজ সাহেব লিখিয়াছেন :—

কার্ভালোর পরিণাম।

* ডুজারিক প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক এই হত্যার বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন পরিশিষ্টে মুল ও তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"Carvalho, the gallant captain of the Portuguese was at Chandican, and the king of Chandican who was then at 'Jasor' sent for Carvalho, and had him murdered in order to ingratiate himself with the king of Arracan. * * That Pratapaditya was a cruel monster, and quite capable of directing the assassination of a brave man like Carvalho, we have, proof enough in the work of his admiring biographer, who tells us that Pratapaditya cut off the breasts of a female slave who had offended him." *

'কার্ভালোর হত্যা যে প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠুরতার আর একটী দৃষ্টান্ত, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কার্ভালো যেরূপ বিশ্বাসী ও সাহসী সেনাপতি ছিলেন, তাঁহাকে ঐরূপ শোচনীয় ভাবে হত্যা করা প্রতাপের ন্যায় বীরপুরুষের কলঙ্ক, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। কেদার রায়ের অধীনে কার্ভালো যেরূপ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। তিনি সেইরূপ বিশ্বস্ততা সহকারে প্রতাপের রণতরী এবং সৈন্য পরিচালনা করিবেন বলিয়াই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আরাকান রাজের ভয়ে প্রতাপ তাঁহাকে এজগৎ হইতে অপসারিত করিয়া দেন। অবশ্য প্রতাপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই কার্ভালোকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যদি আরাকান রাজের ভয় না করিয়া তাঁহাকে আপনার রণতরী ও সৈন্য পরিচালনে নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে হয়ত বাঙ্গলার রাজনৈতিকজগতে আর এক দৃশ্যের উদয় হইত। ফলতঃ প্রতাপ কর্তৃক কার্ভালোর এরূপ শোচনীয় হত্যার সমর্থন করা যায় না।' † এই একটী মাত্র ঘটনা হইতেই কেদার রায়ের

* Beveridge's History of Bakarganj.

† শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রণীত 'প্রতাপাদিত্য' ১৫০ পৃষ্ঠা।

অসীম মহত্ত্ব ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কেদার রায় আরাকান রাজকে বিন্দুমাত্রও ভয় করেন নাই, পুনঃ পুনঃ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয় স্বত্ত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আরাকান নৃপতি বিক্রমপুরাধিপতিকে নির্য্যাতিত করিবার নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিয়াছেন, নানারূপ কৌশলাবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু কোনরূপেই কেদার রায়কে বিপর্য্যস্ত করিতে পারেন নাই, বরং কেদার রায়ের দ্বারাই তাহাকে পুনঃ পুনঃ পর্য্যুদস্ত হইতে হইয়াছে। তারপর কার্ভালোর কথা। কার্ভালোকে কেদার রায় যে শুধু আশ্রয়দান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, বীরের উপযুক্ত সম্মান বীরেন্দ্র কেদার তাহাকে প্রদর্শন করিতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হ'ন নাই, তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সেনাপতির পদ প্রদান করিয়াছেন এবং প্রকৃত কৌশলী রাজনীতি বিশারদ পণ্ডিতের ন্যায় তাহার সাহায্যে স্বীয় অশিক্ষিত নৌ-সৈনিকগণকে সুশিক্ষিত করিয়া বহু সঙ্কট পূর্ণ সমর-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেদার রায়ের অধীনে রহিয়া কার্ভালো যেরূপ অতুলনীয় বীরত্ব, মহত্ত্ব, এবং উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন নিজ জীবনের মায়া স্বীয় প্রভুর সম্মান ও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য সনদ্বীপের যুদ্ধে এবং অবশেষে মেঘনার উপকূলে ও শেষ দিন, সেই শেষ ভীষণ দিনে—যেদিন কেদারবীর বন্দী ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন সে দিবস কার্ভালো পুনঃ পুনঃ আহত হইয়া ও যেরূপ অপূর্ব্ব বীরত্ব সাহসিকতা ও রণ-নিপুণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়-সাগরে পতিত হইতে হয়। এরূপ প্রভুভক্ত মহাবীরের এরূপ শোচনীয় হত্যা শুধু বাঙ্গালীর নহে সমুদয় ভারতবাসীরই ভীষণতম কলঙ্কের কারণ হইয়াছে। ভারতবাসীর আশ্রিত-বাৎসল্য, আতিথেয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির উপর গুরুতর কলঙ্ক কালিমার আরোপণ হইয়াছে। এ ঘটনা দ্বারা অতি

সহজেই প্রতাপ ও কেদার রায়ের চরিত্র সমালোচনা করা যায়। অধিক বাক্য—ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না।

নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে গেলে কেদার রায়কেই বারভূঁইয়া গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে হয়। এই মহাপুরুষ পুনঃ পুনঃ মোগলের গতি প্রতিহত করিয়া অজেয় বাহুবলের শত শত নিদর্শন দেখাইয়া যে অতুল কীর্ত্তি গৌরব সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন সেজন্য তাঁহার নাম চিরদিন চিরকালের জন্য ইতিহাসের বক্ষে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

কীর্ত্তি-কথা।

চাঁদরায় ও কেদার রায় ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের মুখোজ্জল করিয়া' গিয়াছেন। স্বাধীন সেনরাজগণের শুভ অভ্যুদয়ের পরে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের শাসন-প্রভাবে বিক্রমপুরের নানাদিক দিয়া নানাভাবে বিবিধ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল। ইহাঁরা দে উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। কুলীন না হইলেও তাঁহারা বিক্রমপুর সমাজের গোষ্টিপতি ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহাঁদের যেরূপ সম্মান এবং প্রতিপত্তি ছিল সমাজেও তাহা অপেক্ষা কম সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিলনা। রায় রাজগণ কর্ত্তৃক বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কুলীন কায়স্থ বিক্রমপুরে আনীত হইয়াছিল। কুলীন কায়স্থগণের মধ্যে মালখানগরের বসুগণ, রায়সবরের (শ্রীনগরের) গুহ মুস্তৌফি, নীবার ঘোষ এবং কাঠালিয়ার দত্তগণ আনীত হয়। ইহারা সাড়ে তিন ঘর কুলীন বলিয়া কথিত। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় বলেন যে 'যশোহরের কায়স্থ সমাজ' বিক্রমপুরের সমাজ স্থাপনের পরে সংগঠিত হয়। মালখানগর নিবাসী যদুনন্দন বসু বসন্ত রায় কর্ত্তৃক নীত হইয়া, যশোহরের অন্তঃর্গত মঙ্গলপাড়া গ্রামে প্রচুর বৃত্তিসহ বাস করিতে থাকেন। মালখানগর নিবাসী বসুদেব ও রঘুনাথ বসু এইরূপে যশোহর রাজাদেশে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করতঃ যশোহরের অন্তর্গত খোরগাছি ও শ্রীপুর গ্রামে বাস করেন। এই সূত্রে বলা যাইতে পারে, যশোহর কায়স্থ সমাজ প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায়, বিক্রমপুরের রায় রাজগণের সহায়তায়ই এইরূপে বিক্রমপুর হইতে কুলীন

উঠাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।' (১) বসু, গুহ, ঘোষ এই তিনঘর পূর্ণ কুলীন আর দত্ত অর্দ্ধঘর কুলীন ধরিয়া সাড়ে তিনঘর কুলীন কথিত হইয়া থাকে।

বিক্রমপুরে এই সুবিখ্যাত রায় বংশের বহু কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান থাকিয়া বিক্রমপুরের বিক্রম এই ভ্রাতৃদ্বয়ের অপূর্ব্ব স্বদেশ-প্রীতি ও দেশব্যাপী বীরত্বের গৌরব গরিমা প্রকাশ করিতেছে। আমরা এখানে তাঁহাদের কীর্ত্তি ও কার্য্যকলাপের যে যে ভগ্নাংশ অদ্যাপি কঙ্কাল-দেহে বিরাজমান থাকিয়া, জনসাধারণের হৃদয়ে প্রাচীন লুপ্ত-স্মৃতি তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় সঞ্চার করিয়া দিতেছে তাহাদের বিবরণ বিবৃত করিলাম।

বিক্রমপুরের চাঁদও কেদার রায়ের কীর্ত্তি

পূর্ব্বে বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া এক নির্ম্মল সলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত ছিল তাহার নাম কালীগঙ্গা; কালীগঙ্গা বিক্রমপুরের নানাস্থানে নানা নামে অভিহিত হইত। কোথাও ইহার নাম ছিল কাথারিয়া, কোথাও বা কালীগঙ্গাই কহিত। এই কালীগঙ্গার তটদেশেই চাঁদরায়ের ও কেদার রায়ের অতি প্রিয়তম শ্রীপুর নগরী বিরাজিত ছিল। সে সময়ে ফেণিল স্রোতধারা বুকে লইয়া তরঙ্গের ভীষণ ব্যাকুল আরাবে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করতঃ কীর্ত্তিনাশা নদী প্রবাহিত হইত না কীর্ত্তিনাশা নদীর অস্তিত্বও তখন ছিল না। নির্ম্মল সলিলা কালীগঙ্গার তটে সৌধরাজি সমাকীর্ণ শ্রীপুর সে সময় ইন্দ্রপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইত। এখানে সুন্দর ও সুবিশাল কারুকার্য্যসম্পন্ন রাজ-প্রাসাদ, সৈনিকাবাস, বিচারার্থ বিবিধ বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার, সুপ্রশস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজি পরিশোভিত রাজপথ এবং কোটীশ্বর নামক পল্লীতে নানাবিধ

শ্রীপুর।

(১) ফরিদপুরের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

সুন্দর সুন্দর দেব-মন্দির-শ্রেণী শ্যামল বনস্পতি সমূহের মাথার উপর দিয়া উচ্চশীর্ষে রাজকীয় গৌরব বৈভবের পরিচয় দিত। কথিত আছে যে কোটিশ্বর নামক শিবলিঙ্গের বেদীমূলে এক ক্রোড় টাকা প্রোথিত করিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম কোটীশ্বর হয় এবং এই দেবপল্লী উক্তনামে খ্যাত হইয়া পড়ে। এই কোটীশ্বর পল্লীতে দশ মহাবিদ্যা এবং সুবর্ণ-নির্ম্মিত দশভূজা দুর্গা মূর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। দুর্গামূর্ত্তিকে জন সাধারণে স্বর্ণময়ী নামে অভিহিত করিত। কিন্তু হায়! পদ্মার প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের কোন চিহ্নই নাই।(১) কেদার রায় ও চাঁদরায়ের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াই পদ্মা কীর্ত্তিনাশা এই অপনাম লাভ করে। সার্জ্জন জেম্‌স্ টেলার সাহেব তাঁহার Topography of Dacca নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "The first of these Channels, which is represented as the Calliganga in Rennel's maps, is now called Kirtinessa, or Sreepur river, It runs in a little to the north of Rajnagar and Molfutganjue and is considered to be the principal branch of Ganges."

টেলার সাহেবের গ্রন্থ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, অতএব আমরা দেখিতেছি যে ৭৩ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই কায়স্থবংশীয় এই জমিদার ভ্রাতৃদ্বয়ের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া ইহা কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়া আসিতেছে। ভট্ট কবিরা এখনও বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে পর্ব্বোপলক্ষে গাহিয়া থাকেন :—

"চাঁদ কেদার রায়ের কীর্ত্তি চমৎকার
ভেঙ্গে নিল কোটীশ্বর,
গোবিন্দ মঙ্গল, সোণার দেউল
খাকুটিয়াদি গ্রাম বহুতর।"

(1) The cite on the opposite side of t[illegible]gna was not Senergong, but Seripore which stood in Bikra[illegible], and was destryoed by the Kritinasa.

(Taylor's Topography of Dacca P. 108.)

পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীগণের লিখিত বিবরণী হইতেও শ্রীপুর নগরীর অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ডুজারিক, পাইমেণ্টা প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে শ্রীপুর সম্পর্কে অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। পর্ত্তুগীজগণ এবং জেসুইট পাদ্রীগণ এক সময় শ্রীপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীপুর হইতে তাঁহারা নানাস্থানে যে সকল লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন সে সকল পত্রের মূল ও বঙ্গানুবাদ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল। টেইলার সাহেব লিখিয়াছেন :—

"Seeripore," was situated about six leagues to the south of sunergong. Portuguese are said to have settled here, about the middle of the 16th century., †

ইংরেজ ভ্রমণকারীগণের মধ্যে একমাত্র রাল্‌ফ-ফিচই (Ralph-Fitch) সোণারগাঁ ও শ্রীপুর গমন করিয়াছিলেন. তিনি শ্রীপুরকে 'Great city' বলিয়া উল্লেখ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ফিচ ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে সোণারগাঁ গমন করেন—তিনি শ্রীপুর হইতেই সোণারগাঁ গমন করিয়াছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজ রাজাবাড়ীর নিকট পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলে শ্রীপুরের 'চড়া' দেখিতে পাইয়াছিলেন, তৎকালে উহা 'শ্রীপুরের টেক,নামে অভিহিত হইত এবং অদ্যাপিও হইয়া থাকে। এক সময়ে ঐ চড়া ভূমি যে প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল একথা তিনিও শুনিতে পারিয়াছিলেন। ঐ দ্বীপ বা চড়াভূমি ক্রমশঃ তীরের সহিত সংলগ্ন হইয়া শ্রীপুরের টেক নামে অভিহিত হইতে থাকে। পূর্ব্বে এস্থানে গভর্মেণ্টের বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের আফিস বিদ্যমান ছিল।

† Topography of Dacca page 70.

‡ Near Rajabari. where there two great rivers (Magna and padda) meet, an island called sripur has always existed. There is still a tradition that it was formerly a place of great trade. At the present day, this island has joined on to the mainland and is called Sripur Tak, i, e., Sripur point. There was formerly a custom house here, where Sayir, or transit duties were collected by the Government. J. Wise Notes on Sunargaon, P. 86-87. J. R. A. S. B. 1874.

'১৮২২ খ্রীঃ অঃ ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট জন পীটারসন ঢাকা জেলার দুর্গ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট লিখেন তাহাতে চণ্ডীপুরের কেল্লা নামক একটী প্রাচীন কেল্লার উল্লেখ আছে ঐ কেল্লাই শ্রীপুরের কেল্লার অংশ বিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইত। রেণেল সাহেব যখন ম্যাপ প্রস্তুত করেন সে সময়েও শ্রীপুরের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি শ্রীপুরের ন্যায় প্রসিদ্ধ স্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

রাজাবাড়ীর মঠ।

এই বিখ্যাত রায়বংশের যে কয়টী ক্ষীণ কীর্ত্তিরেখা অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া তাঁহাদের নাম স্মরণ করাইয়া দেয় তন্মধ্যে রাজাবাড়ীর মঠ, কেদারবাড়ী, কেশার মার দীঘি এবং কাঁচকীর দরজাই প্রধান। এ কয়টির মধ্যে আবার রাজাবাড়ীর মঠই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় কীর্ত্তিস্তম্ভ। যাঁহারা পদ্মাবক্ষে গোয়ালন্দ, ঢাকা কিংবা চাঁদপুরের দিকে যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এই মঠটিকে দর্শন করিয়াছেন। বহুদুর হইতেই ইহা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বিক্রমপুরের আর কোথাও এতাদৃশ প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান নাই। উত্তালতরঙ্গময়ী ভয়ঙ্করা পদ্মা এখন ইহার অতি অল্প দূর দিয়া খরবেগে প্রবাহিতা। শীঘ্রই যে রায়বংশের এই শেষ কীর্ত্তি চিহ্নও সর্ব্ব গ্রাসিনীর কুক্ষিগত হইবে ইহা সিঃসন্দেহ। এই মঠের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নানাবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

(১) কেদার রায় মাতৃশ্মশানোপরি এই মঠ নির্ম্মাণ করিয়া বলিলেন যে 'এতদিনে মাতৃদায় হইতে উদ্ধার পাইলাম।' এই কথা তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইবা মাত্রই ভীষণ শব্দে মঠের চূড়া ভাঙ্গিয়া ভূমিতলে পতিত হইল। যাঁহার স্নেহের ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো জগতে নাই, সেই স্নেহশালিনী জননীর শ্মশানোপরি মঠ নির্ম্মাণ
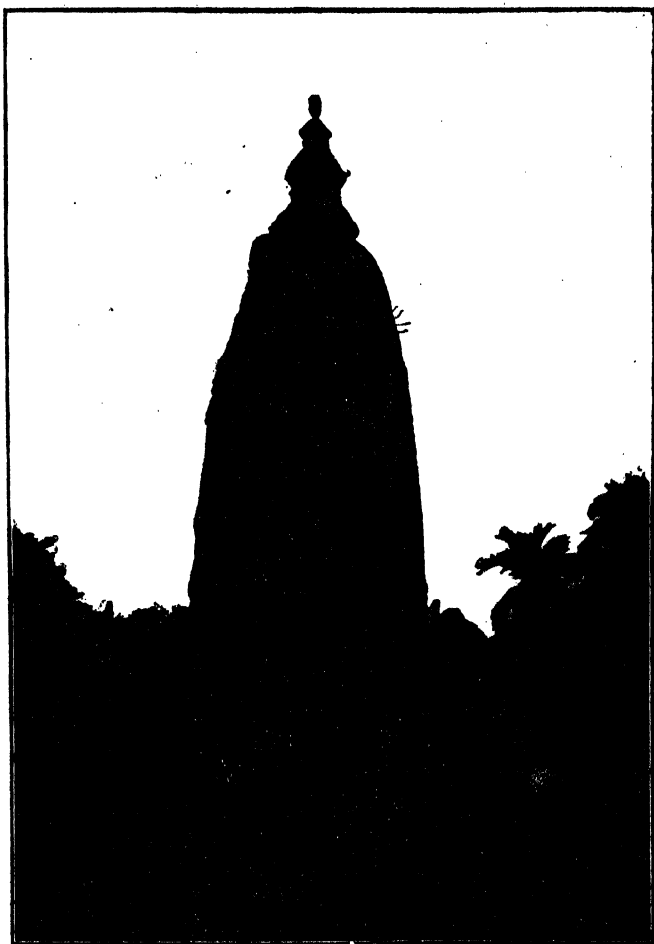
রাজাবাড়ীর মঠ।

করিলেই কি তাঁহার স্নেহ-ঋণ শোধ হইতে পারে ? এ উক্তির মধ্যে যে কোন প্রকার সত্য নিহিত আছে, তাহা আমাদের মনে হয় না, তবে অতি শৈশব হইতেই বৃদ্ধদের নিকট নানা অলঙ্কারের সহিত আমরা এই জন-প্রবাদ শুনিয়া আসিতেছি।

(২) দ্বিতীয় কিংবদন্তী এই যে স্থপতি বহু বৎসর পর্য্যন্ত মঠের কার্য্য করিয়া অন্যান্য অংশ যেরূপ সুন্দর করিতে সক্ষম হইল শীর্ষ দেশ কিছুতেই সেইরূপ মানান সই করিয়া উঠিতে পারিল না। যেরূপ ভাবে চূড়া নির্ম্মিত হইলে মঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইত, সেইরূপ না হওয়ায় কেদার রায় স্থপতিকে ভৎর্সনা করিলেন ও প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলেন। স্থপতি ভাবিল যে কিছুতেই যখন আমা দ্বারা ইহা অপেক্ষা সুন্দর চূড়া হইবে না, তখন এক রকমে না এক রকমে আমার প্রাণ যাইবেই যাইবে, যখন মরিতেই বসিয়াছি তখন একটা অনিষ্ট করিয়াই যাই। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থপতি কেদার রায়কে কহিল "মহাশয় ! আপনি আদেশ করিলে আমি পুনরায় মঠের সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।" কেদার রায় তাহাকে অনুমতি দিলেন, স্থপতি স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ মঠের উপর আরোহণ করিয়া উহার চূড়া ভগ্ন করিয়া সেই সঙ্গে নিম্নে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। প্রকৃতপক্ষেই রাজাবাড়ীর মঠের চূড়া ছিল না। আমাদের বিশ্বাস যে কেদার রায়-যুদ্ধ-বিগ্রহে পতিত হইয়া যথা সময়ে মন্দিরের কার্য্য শেষ করাইতে না পারায় পল্লীবৃদ্ধগণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে এইরূপ নানা গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। এ সকলের যথার্থতা নিরূপণ করা সুকঠিন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাগ্যকুলের স্বনামধন্য রাজা শ্রীনাথ রায়ের অর্থানুকূল্যে এই মঠটির সংস্কার এবং উহার উপরের চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। সংস্কারের পর ইহার দ্বারের উপরিভাগে যে খোদিত প্রস্তর ফলক স্থাপিত হইয়াছে পাঠকবর্গের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহা এই—

"This structure being an ancient and sacred Hindu Monument and a valuable land mark for the District. Erected by Chand Ray and Kedar Ray over the funeral pyre of their mother in the sixteenth century was repaired in 1896 at the cost of Raja Sree Nath Ray of Bhaghykul by Babu Sashi Bhusan Mitter District Engineer under the order of C. J. S. Foulder Esq collector of Dacca. কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বে এস্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল; ডাক্তার ওয়াইজের অনুসরণে 'বিশ্বকোষের' নগেন্দ্র বাবুও উহাকে শিবালয় নামে অভিহিত করিয়াছেন—আমরা কিন্তু এ উক্তির সত্যাসত্যের কোনও প্রমাণ পাই নাই। সে যাহাই হউক এই বৃহৎ ও সুন্দর মঠটি যে বিক্রমপুরের গৌরব তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার গাত্রস্থ ইষ্টক সমূহে অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র ফুল কাটা দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ গঠনের মঠ বাঙ্‌লা দেশে এখন আর নাই।

রাজাবাড়ী আউট্‌পোষ্টের প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মঠটি অবস্থিত। মঠের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কক্ষ আছে, ইহার নিম্নাংশ বহু পরিমাণে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। গভর্মেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগ হইতে প্রকাশিত বিবরণীতে এই মঠটির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ লিখিত হইয়াছে,—

'It is a monumental tower of brick masonry built, it is said over the funeral pyre of the mother of Chand Rayya and Kedar Rayya who were about 300 years ago some independent princes of the locality. It is known as the Rajabari Math. It Measures 30 feet square at base and about 80 feet in height and has a
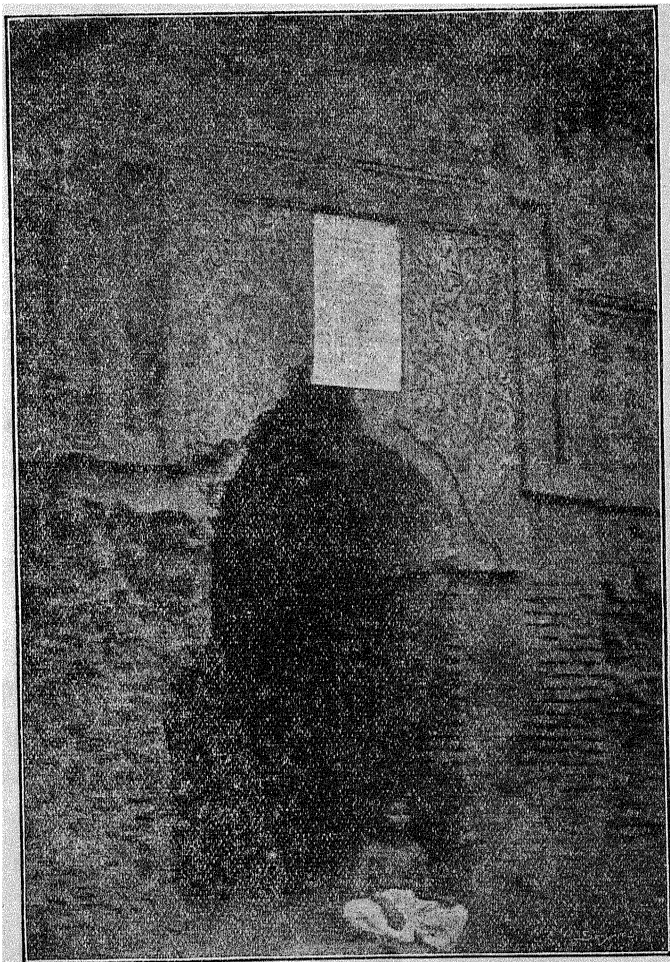
রাজাবাড়ীর মঠের সম্মুখ ভাগ।

small room within it. The dimensions of the Math are large and its proportions elegant. It stands up as a conspicious land mark visible for many miles across the Ganges on the south and the Megna on the north. (P. 24. List of Ancient Monuments in the Dacca Division.) এই মঠটির বিষয় সুবিখ্যাত রেণেল সাহেব, ডাক্তার টেইলার এবং ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবও স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে এবং প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।* মঠটি বর্ত্তমান সময়ে ৮০ ফিট উচ্চ। ইহার নিম্নাংশের

* (1) The village of Rajabary is situated on Ye western side of the Megna in Lat 23°—21' N distant from Dacca 22 miles from Lucky pour 34. An old Pagoda stands ¾ of a mile to the south west of it. The village has formerly been large, but it now reduced to a small Bazar only. An extensive cluster of Islands divides Ye River into a number of Channels opposite Raja-bary froms several commodious Harbours for boats. (The Journals of Major James Rennell. Edited by T. H. D. La Touche—1910.)

(2) The Mutt of Raja-baree which forms a conspicuous land mark from the Ganges and Megna, is said to have been erected by this Raja (Chand Ray). Topography of Dacca P. 103.

(3) There is the lofty Rajabari Math which is a prominent land mark for miles around, on the left bank of the river padma. It stands at a short distance from where the great City of Sripur formerly was. This Math is a four-sided tower, twenty-nine feet square at the base. In the first thirty feet, the walls are ornamented with various patterned bricks in imitation of flowers. The middle of each face raised and ribbed. The walls are eleven feet thick, and the bricks used in their construction are of peculiar shape. They are large than those found in Mahameddan buildings of the same age, and being eight inches square, and one and a half thick. On the summit is a large spherical mass, round which several picterusque pipul trees thus have entwined their roots and are gradually destroying the suitable of the spire.

This Math was a shrine dedicated to Shiv: But as it is buried in the midst of dense jungle and marshes, it ts rarely visited at the present day—J. R. A. S. B., 1874. (James Wise) ওয়াইজ সাহেব ঊনচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজাবাড়ীর মঠ যেরূপ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন ১৮৯৬ খ্রীঃ অঃ সংস্কারের পর তাহার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ইহা পদ্মাতীরে শেষের সে-দিনের' অপেক্ষা করিতেছে।

বেষ্টন ১২০ ফিট। এ স্থলে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের একটী বাড়ী ছিল বলিয়াই ইহার নাম রাজাবাড়ী হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইহা কেদার রায়ের যাত্রা বাড়ী ছিল। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন 'বহুদিন হইতে বিক্রমপুরে দুইটী কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে একটী চাচইরতলার ঠারইণবাড়ী অপরটী মাঐসারের দিগম্বরীবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ যে চাঁচইরতলাতে ব্রহ্মানন্দগিরি এবং মাঐসারে গোসাঞিং ভট্টাচার্য্য সিদ্ধিলাভ করেন। কেদার রায় মাতৃ নিদেশক্রমে এই পীঠস্থানবৎ চাচইরতলার নিকট অপর একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যাহা অদ্যাপি রাজাবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বাস করিয়া অনায়াসে সর্ব্বদা দেবীর অর্চনা করা যাইতে পারিবে, এই মানসেই ঐ বাড়ী নির্ম্মিত হইয়া রাজাবাড়ী আখ্যা প্রাপ্ত হয়।' তাঁহার এ উক্তি সমীচিন বলিয়াই মনে হয়। রাজাবাড়ী ইহার নামোৎপত্তির সম্বন্ধে কার্য্যতঃ ওযে এরূপ কোন সম্বন্ধ ছিল তাহা স্থির নিশ্চিত। এই গ্রামের চতুর্দ্দিকস্থ পরিখা যাহা এখন 'রাজাবাড়ীর খাল' নামে পরিচিত তাহা এবং বৃহৎ বৃহৎ সরোবর, বুজরণ বা বুরুজ বাঁধানঘাটের ধ্বংসাবশেষ, রাস্তার চিহ্ন ইত্যাদি দেখিয়া সহজেই ইহার প্রাচীন কীর্ত্তি গরিমার কাহিনী উজ্জলবর্ণে মানসপটে চিত্রিত হইয়া যায়। রাজাবাড়ীর মঠ চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের মাতৃ-শ্মনানোপরি নির্ম্মিত। রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী চাচইরতলার জাগ্রতা দেবীর উপাসনা করিতে করিতে যে এখানেই দেহত্যাগ করেন এই মঠটিই তাহার প্রমাণ। কাহারও কাহারও মতে এস্থানে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের প্রমোদোদ্যান ছিল। কেদাররায়ের উক্ত বাগানবাটী হইতেই রাজার বাড়ী নামের সঙ্গে সঙ্গে ইহা এক্ষণে রাজাবাড়ী নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের বিশ্বাস যে ইহাই চাঁদরায় কেদার

বারভূঁইয়া—শ্রীআনন্দনাথ রায়।
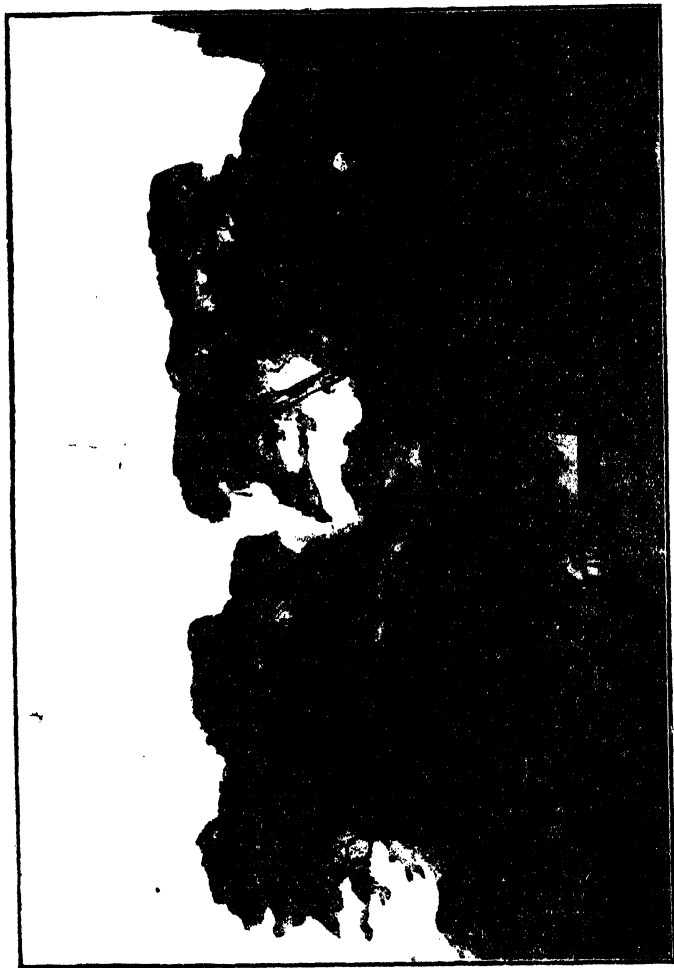
চাচইরতলার কালীবাড়ী।

রায়ের আদিম রাজধানী ছিল পরে আড়াফুলবাড়িয়া বা শ্রীপুরে পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহারো পরে কেদারপুরে অপর এক বাটী নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন।

চাচইরতলার কালীর বাড়ী সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব। ইহার প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস কেহই বলিতে পারেন না। প্রাচীন কাগজ পত্রাদি হইতেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। পদ্মার উত্তর তীরে এই পীঠ স্থানটি অবস্থিত। কতবার পদ্মা ইহার সমীপবর্ত্তী হইল, কতবার ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় বলিয়া জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার হইল কিন্তু বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান বলে এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই হয় নাই। এ সম্বন্ধে একটী জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম।

চাচইরতলার কালীবাড়ী ও মনাই ফকির।

বিক্রমপুর অঞ্চলে এক সময়ে যে সকল সিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে মনাই ফকিরের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। মনাই ফকিরের জীবন-সম্পর্কিত বিবরণ সংগ্রহ করা এখন একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহু কষ্টে নানাজনের মুখ হইতে যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এখানে তাহাই উল্লেখ করা গেল। তাঁহার জন্মস্থান বিক্রমপুরের পশ্চিমভাগস্থ কোন গ্রাম। মনাই এক দরিদ্র মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে পিতার একমাত্র পুত্র ছিল। মনাইর জন্মের পূর্ব্বে তাহার পিতামাতার আরও কতকগুলি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া একে একে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। কৃষক-দম্পতি সন্তানাভাবে মনের কষ্টে দিনাতিপাত করিতেন। একদিবস জ্যৈষ্ঠের দারুণ দ্বিপ্রহরে এক উলঙ্গ ফকিরের আবির্ভাব হইল। ফকিরের দীর্ঘ-রুক্ষকেশ, আজানুলম্বিত বাহু, উজ্জ্বলনেত্র, বিশালদেহ দেখিয়া গ্রামের

সকলেই বিস্মিত হইল। তৃষ্ণার্ত্ত ফকির দ্বারে দ্বারে পানীয় প্রার্থনা করিলেন কিন্তু কি জানি কোন্ অজ্ঞাত আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া কেহই তৃষ্ণার্ত্ত ফকিরকে একবিন্দু বারিও দান করিলেন না। তৃষিত ফকির অভিশাপ দিতে দিতে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গ্রামের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

গ্রামের প্রান্তদেশে মনাইর পিতা মাতার গৃহ। কৃষক ক্ষেত্রে কাজ করিতে গিয়াছে। মনাইর জননী তখন সসত্বা। তিনি একটী বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। এরূপ সময়ে ফকির আসিয়া পানীয় প্রার্থনা করিল। কৃষক রমণী অকুণ্ঠিত চিত্তে এক ঘটি শীতলজল ফকিরকে পান করিতে দিলেন, তৃষিত ফকির শীতলজল পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া কৃষক রমণীকে বলিলেন "বৎসে! আমি তোমার মনঃকষ্টের কারণ জানি, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি এবার তোমার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে সে দীর্ঘজীবি হইবে এবং অপূর্ব্ব কীর্ত্তিশালী হইবে, কিন্তু বৎসে! সেই পুত্র যখন যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইবে তখন আমি তাহাকে আমার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিব। তাহাকে কেহই রাখিতে পারিবে না।" এইরূপ বলিয়া ফকির চক্ষের নিমেষে সেখান হইতে অন্তঃহিত হইলেন। স্বামী গৃহে আসিলে কৃষক-পত্নী তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, কৃষক আহারাদি না করিয়াই তৎক্ষণাৎ ফকিরের সন্ধানে বাহির হইলেন কিন্তু আর ফকিরের সন্ধান মিলিল না।

ষোল বছর চলিয়া গিয়াছে। কৃষক মৃত। কৃষক-পত্নী মূর্খ পুত্র মনাইকে সহ অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন। মনাই একটু হাবার মত নিজের মনে এক স্থানে বসিয়া বসিয়া দিন কাটায় তাই একা কৃষক রমণী-কেই সংসারের সবদিকের তত্ত্ব তালাস করিতে হয়। মূর্খ হইলেও মনাই মাতার একান্ত পক্ষপাতী, মায়ের কথা সে কোন রকমেই হেলা করে না

আর পরোপকারই যেন তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই অল্প বয়সেই সে পাড়া প্রতিবেশীর উপকার করিতে একটুও পরাঙ্মুখ—নহে। সে মূর্খ কেননা সে আর আর কৃষক বালকগণের ন্যায় শুধু সংসারের আবর্জ্জনা লইয়া শুধু বেঁচাকেনার দরদস্তুর লইয়াই থাকিত না। তাহার মুখভাবে এমনি একখানা সুন্দর ফুলের মত নির্ম্মল হাসি খেলিয়া বেড়াইত যে কেহই কোন দিন তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইত না। সরল-মূর্খ উদার-চরিত্র কৃষক বালক এমনি করিয়া মায়ের স্নেহাঞ্চলে বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছিল।

সেবার গ্রামে বড় বসন্তের পীড়া। মনাইর মাতাও পীড়িতা। গ্রাম জনশূন্য। দ্বিতীয় প্রহর নিশি—গ্রাম নিস্তব্ধ। এরূপ সময়ে মনাইর মাতা—একমাত্র পুত্রকে চির জীবনের মত আশীর্ব্বাদ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। নিঃসহায় বালক একাকী জননীর শব-দেহের শেষ সৎকার করিবার জন্য শবদেহ বাহিরে আনয়ন করিয়াছে, এমন সময় ক্ষীণ-জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইল—কে একজন দীর্ঘাকার পুরুষ তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মনাই ভীত চকিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'কে তুমি?' ফকির বলিলেন 'বৎস, আজ ষোড়শবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে তোমাকেই লইতে আসিয়াছি। তুমি তোমার মাতার শেষকার্য্য সম্পাদন করিয়া আমার সহিত আইস।' সংসারের সহিত মনাইর সম্বন্ধ এইরূপেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তারপর মনাই ফকির কোথায় কি ভাবে কত দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহা কেহই বলিতে পারে না।

সাধন লাভের পরে প্রায় বৃদ্ধ বয়সে মনাই ফকির পাঁচচর-বরমগঞ্জে বাস করিতেন—তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ অলৌকিক জন-শ্রুতি প্রচলিত আছে। সুধারাম বাউল ও মনাই ফকির সমসাময়িক। কথিত আছে যে মনাই ফকির ব্যাঘ্রারোহণে সুধারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। খড়ম পায়ে দিয়া নদী উত্তীর্ণ হওয়া—মৃত ব্যক্তির জীবন

প্রদান ইত্যাদি বিবিধ কিংবদন্তীর ত অভাবই নাই! সুধারাম বাউলের ন্যায় মনাই ফকিরের রচিতও দুই একটী সঙ্গীত ফকির ইত্যাদির মুখে অদ্যাপি গীত হইতে শোনা যায়। সেগুলি কবিত্ব-মাধুর্য্যে বা শব্দ-সম্পদে গরীয়ান নহে—কিন্তু সরল সাধুর অন্তর্নিহিত মধুর ভাব—সাধনের গূঢ় তথ্য সমূহ সে সকলের মধ্যে পদ্মকোষ-নিবদ্ধ মধুর ন্যায় গুপ্তভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। কথিত আছে যে কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তি একবার মনাই ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে কীর্ত্তিনাশা নদী কালে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিবে? —তাহাতে ফকির বলিলেন যে 'তোমরা আমার হস্তপদ বন্ধন করিয়া একটী থলিয়ার ভিতর পুরিয়া কীর্ত্তিনাশা-জলে নিক্ষেপ কর সপ্তাহান্তে আমাকে এখানেই পাইবে সে সময়ে আমি তোমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিব। তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য হইল। সপ্তাহান্তে সকলে সমবেত হইয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর চাহিলে তিনি বলিলেন, দেখ কীর্ত্তিনাশার উত্তর পারে চাচইরতলার ঠাকরুণবাড়ী এবং দক্ষিণ তটে মাঐসারের দিগম্বরীতলা বিরাজমান থাকিবে। আর এই দুই দেবী স্থানের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান দেখিতেছ সে সমুদয়ই অচিরাৎ কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইবে। রাজনগরের শতরত্ন মঠও একুশরত্ন মঠের নীচে সোণার ইলিশ মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে দেখিতে পাইয়াছি। তবে শ্রীপুরের টেক কোন কালেই ধ্বংসীভূত হইবে না।'

এই চাচইরতলার কালীবাড়ীর প্রসিদ্ধি যে কত দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার সঠিক বৃত্তান্ত কেহই বলিতে পারেন না। রাজাবাড়ীর মঠের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে চাচইরতলা নামক গ্রামে এই কালীবাড়ী অবস্থিত। পদ্মা-বক্ষ হইতেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ সুন্দর শান্তি পূর্ণ স্থান উভয় বিক্রমপুরের মধ্যেই অতীব বিরল। জন-কোলাহল হইতে দূরে একটী খালের পাড়ে (চাচইরতলার খাল নামেই এই খাল পরিচিত) সুরম্য

তপোবনের ন্যায় বট, তেঁতুল, আম্র প্রভৃতি প্রাচীন মহীরুহরাজির শীতল ছায়ায় শষ্পাচ্ছাদিত প্রান্তর-ভূমে জগন্মাতা বিক্রমপুরবাসীর স্নেহময়ী রক্ষয়িত্রীরূপে বিরাজিতা। নানা দেশ-দেশান্তর হইতে প্রতিদিন দেবীকে দর্শনের নিমিত্ত এখানে লোক-সমাগম হইয়া থাকে। এই কালী প্রত্যক্ষ জাগ্রতা দেবী। ইঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ জাগ্রতা দেবীর অর্চ্চনা করিতে করিতে দিব্যধাম লাভের কামনা সেকালের ধর্ম্ম-পরায়ণা প্রচীনা রমণীর হৃদয়ে উদ্রেক হওয়া খুব স্বাভাবিক। কাজেই কেদার রায়ের জননী দেবীর অর্চ্চনার সুবিধা হইবে বলিয়া এস্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্বে এস্থানে নরবলি হইত শোনা যায়। চাচর অর্থে কেশ, লোকে এস্থানে চুল দেয় বলিয়াই যে এস্থানের নাম চাচইরতলা হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

কেদারপুর—কেদার বাড়ী।

কেদার রায় বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুর এই উভয় পরগণার মধ্যস্থলে একটী সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশে উহার চতুর্দ্দিকে পরিখা ইত্যাদি খনন করিয়াছিলেন, রাশীকৃত ইষ্টকাবলী ও সংগৃহীত হইয়াছিল। এমনকি কয়েকখানা অট্টালিকার মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত গ্রথিত হইয়াও উহার কার্য্য শেষ হয় নাই। সাধারণে এখনও ঐ স্থানকে কেদারপুর বা কেদারবাড়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। Taylor সাহেব তদীয় Topography of Dacca নামক গ্রন্থে কেদারপুর সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 'At Kedderpore there are the remains of residence, which is said to have belonged to Rajah of the name Chande Roy, or the Boonneahs, who appear to have extended their authority to several parts of the country,

west and south of the Borriganga, during the decline of the kingdom of Bangoz. This place, which is now a heap of bricks, is of considerable extent but it is so over grown with jungle, and infested with snakes that its outline can not be ascertained.' এ অনেক দিন আগেকার কথা। এখন ঐ স্থান সুপরিষ্কৃত এবং তাহার সন্নিকটে কয়েকজন ধনী সাহা জাতীয় ভদ্রলোক আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

কাচ্‌কীর দরজা।

ইহা একটী বৃহৎ রাস্তা। ইদিলপুরের অন্তর্গত বুড়ীর হাট হইতে আরম্ভ করিয়া উহার এক শাখা বিক্রমপুরের বক্ষ ভেদ করিয়া ধলেশ্বরী নদীর তট পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। এই রাস্তা দুইটী বক্রভাবে বিক্রমপুরের প্রায় অধিকাংশ গ্রামের নিকট দিয়া ঘুরিয়া যাওয়ায় সেকালে যাতায়াতের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। সেন-রাজগণের সময়ে নির্ম্মিত কতকগুলি রাস্তার সহিত কাচ্‌কীর দরজা সংযোজিত হওয়ায় জন-সাধারণের যে কত উপকার হইত তাহা বলাই বাহুল্য। এখন ইহার কতকাংশ পদ্মার কুক্ষিগত, কতকাংশ অরণ্যানীতে এবং কতকাংশ কৃষকের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে এখনও সামান্য পরিমাণে এই সুদীর্ঘ রাস্তাটির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কাচ্‌কীর দরজার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, একজন জ্যোতির্ব্বিদ কেদার রায়ের জননীর অদৃষ্ট গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মৎস্যের কণ্টক-বিদ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইবে। মাতৃভক্ত পুত্র মাতাকে এইরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাচকী গুড়া, মৎস্য প্রত্যহ ধলেশ্বরী, মেঘনা, পদ্মা, প্রভৃতি নদী হইতে আনয়ন করিবার

* Topography of Dacca Page 103.

সুবিধার্থ এই রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেজন্যই ইহার নাম কাচ্কীর দরজা। বল্লাল সেনের জননীর সম্পর্কেও এইরূপ একটী জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে, এই সকল জন-প্রবাদের মধ্যে বিন্দু মাত্রও সত্য নিহিত আছে কিনা তাহা বিচক্ষণ পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস ইহা রাজনৈতিক উদ্দেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহাতে কোনও বহিঃশত্রু আক্রমণ করিলে যুদ্ধোপকরণ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে যথাস্থানে নীত হইতে পারে এবং সৈন্যগণ ও রসদ ইত্যাদি অনায়াসে বিক্রমপুরের সুদূর প্রান্ত হইতে ও অত্যল্প সময়ের মধ্যে যথাস্থলে পঁহুছিতে পারে তদ্রূপ কোনও উদ্দেশ্য লইয়াই এই সুগম পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নামোৎপত্তির অন্যান্য ইতিহাস ঠাকুরমার উপকথা মাত্র।

কেশারমার দীঘি।

রাজাবাড়ীর মঠের ন্যায় উত্তর বিক্রমপুরের কেশারমার দীঘী ও চাঁদ কেদার রায়ের আর একটী কীৰ্ত্তি। কেশারমার দীঘির সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, উপযুক্তরূপ দীঘি খনিত হইল কিন্তু তথাপিও উহাতে জল উঠিল না, ইহাতে কেদার রায় নিতান্ত বিস্মিত হইলেন ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় একদিন রজনী-যোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে, যদি তাঁহার ধাত্রীমাতার গর্ভসম্ভূত পুত্র কেশা দীঘির মধ্যদিয়া অশ্বারোহণে যায় তাহা হইলে ইহাতে জল উঠিবে। কেদার প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন, কেশাকে এই কথা বলায় সেও উহাতে স্বীকৃত হইল। অপরাহ্ন সময়ে যেমন কেশা অশ্বারোহণে দীঘির মধ্যে গিয়াছে অমনি প্রবল-নাদে চারিদিক হইতে জল উঠিয়া অশ্বসহ তাহাকে ডুবাইয়া ফেলিল, উপস্থিত জনবৃন্দ চারিদিক হইতে হাহাকার করিয়া উঠিল, তাহারা শত চেষ্টা

করিয়া আর কিছুতেই তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না। কেশার মা পুত্রের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে শোকাকুলিত চিত্তে 'কেশা কেশা' করিয়া চীৎকার করিতে করিতে সেই প্রবল জল-ধারার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পুত্রের অনুগমন করিল। কেশার ও তাহার মাতার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে, বিশেষ কেশার মার এইরূপ পুত্র স্নেহের নিমিত্ত আত্ম-বিসর্জ্জন করায় ক্ষুব্ধচিত্তে কেদার বলিলেন 'আজ হইতে এই দীঘি 'কেশার মার দীঘি নামে পরিচিত হউক।' কেদারের এ আদেশ সকলেই শোক-পূর্ণ চিত্তে শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, তদবধি ইহার নাম হইয়াছে কেশার মার দীঘি। এই দীঘির সম্বন্ধে অপর একটী জন প্রবাদ এই যে দীঘি খনিত হইল তথাপি বহু দিবস পর্য্যন্ত উহাতে জল উঠিল না। ইহাতে রাজা বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, পরে স্বপ্নাদেশ হইল যে যদি এক পুত্রের মাতা তদীয় পুত্র কাটিয়া রক্ত দান করেন তাহা হইলে দীঘিতে জল উঠিবে। কেদার রায়ের ধাত্রীমাতার কেশা এক মাত্র পুত্র ছিল, কেশা কৈবর্ত্ত জাতীয় ছিল। রাজাদেশে দীর্ঘিকার তটে কেশার শির-চ্ছেদ হয়। পুত্র-বিয়োগ-শোক-কাতরা জননীর শোক অপনোদনার্থ কেদার রায় এই দীর্ঘিকার নাম রাখিলেন কেশার মার দীঘি। এক সময়ে বিক্রমপুর অঞ্চলে তন্ত্রের কিরূপ প্রাধান্য ছিল এসকল কাহিনী হইতেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন যে 'কেশার মাতা পতিপুত্রহীনা হইয়া পতিকুলের প্রভু চাঁদরায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন-যাপন করিত। বিক্রমপুরাঞ্চলে সিকদার বা নফর বলিয়া যে এক সম্প্রদায় ক্রীত-দাস আছে, তাহাদের রমণীরা বিপন্নাবস্থাতে এইরূপে প্রভুকুলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রভু পরিবারের অপরাপর রমণীর ন্যায় স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকে। ... ... কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিলে পর

তাঁহার পিতা কেশার মাকে তাহার ধাত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া পুত্রের প্রতিপালন ভার তৎপ্রতি ন্যাস্ত করেন। কেদার রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর ধাত্রীমাতার ইচ্ছানুসারে ঐ বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তদ্দ্বারা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এ জন্য ঐ জলাশয়ের নাম হয় কেশার মার দীঘি। আর ও প্রবাদ এই যে কেশার মা যতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, ততদূর পর্য্যন্ত এই সরোবর খনিত হইবে বলিয়া কেদার রায় প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ধাত্রী প্রায় এক মাইল স্থান চলিয়া যাওয়ার পর অন্য লোক কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়। এই জন্য ঐ দীর্ঘিকাও এক মাইল ব্যাপী স্থান লইয়া খনিত হয়"। * আনন্দ বাবু ঢোল সমুদ্র বা কেশার মার দীঘি এইরূপ লিখিয়াছেন; তাহা প্রকৃত নহে। আর কেশার মার দীঘির কোন অংশই এ পর্য্যন্ত 'মেঘনা নদীর গর্ভে বিলীন' হয় নাই। ঢোল সমুদ্র ও কেশার মার দীঘি দুইটি স্বতন্ত্র জলাশয়।

রাজাবাড়ীর প্রায় এক মাইল উত্তরে অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ও পোয়া মাইল প্রশস্ত এই দীঘিটি অবস্থিত। এখন ইহার বক্ষে কৃষাণেরা ধান্য পাট ইত্যাদি নানাবিধ শস্যের চাষ করে। বর্ষার সময়ে দীঘিটি জলে ভরিয়া যায় তখন দেখিতে পরম রমণীয় হয়। ইহার চারি পারেই বস্তি। এই দীঘির পারস্থিত প্রসিদ্ধ হাটটী বিক্রমপুরে দীঘির পারের হাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার দক্ষিণ তীরে একটী ভগ্ন ইষ্টক স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে কি ছিল কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কেহ বলেন মস্‌জিদ ছিল, কেহ বলেন বাঁধান ঘাট ছিল, উহার অবস্থা দেখিয়া আমাদের নিকট শেষোক্ত সিদ্ধান্তই যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয়। এই দীর্ঘিকার তীরে একটি বিরাটাকার তেঁতুল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

* বারভূঁইয়া—১১৪ পৃষ্ঠা।

রেণেল ও দীঘিরপারের নামোল্লেখ করিয়াছেন যথা—'Meghna or Brahamputry is only 8½ miles so that the Peninsula formed by the 2 rivers is not 12 miles over in this place.

At the bottom of the reach close by *Diggarypara* a large breek runs out to ye south east, but falls into the great river again after taking a course of 10 or 12 miles.' †

ঢোল-সমুদ্র।

ঢোল-সমুদ্র নামক বিশাল দীর্ঘিকাও কেদার রায়ের অন্যতম কীর্ত্তি। রেণেলের মানচিত্রে ঢোল-সমুদ্রের চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। 'লঘুভারতকার' লিখিয়াছেন ;—

'কেদার রায় জননী চথানৈকংসরোবরং।
অদ্যাপি বর্ত্ততে ঢোল সমুদ্রাখ্যং ফরিদপুরে ॥'

ইহা হইতেও জানিতে পারা যায় যে ঢোল-সমুদ্র কেদার রায়ের জননী খনন করিয়াছিলেন। এই বিশাল সরোবর মহারাজ রাজবল্লভ খনিত রাজনগরের রাজ-সাগর অপেক্ষাও বৃহত্তম ছিল। ঢোল-সমুদ্র নামের অর্থ এই যে ইহার একপার হইতে ঢাকির আওয়াজ করিলে অপর তীর হইতে তাহা শুনা যাইত না। ঢোল সমুদ্র বহু দিন হইল কীর্ত্তিনাশার অতল গর্ভে চির-বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজ পর্য্যন্তও ইহার কাহিনী অতি প্রাচীনের মুখে উপন্যাসের রঞ্জিত ভাষায় শুনিতে পাওয়া যায়।

† The Journals of Major James Rennele. Edited by T. H. D. Ladouche.
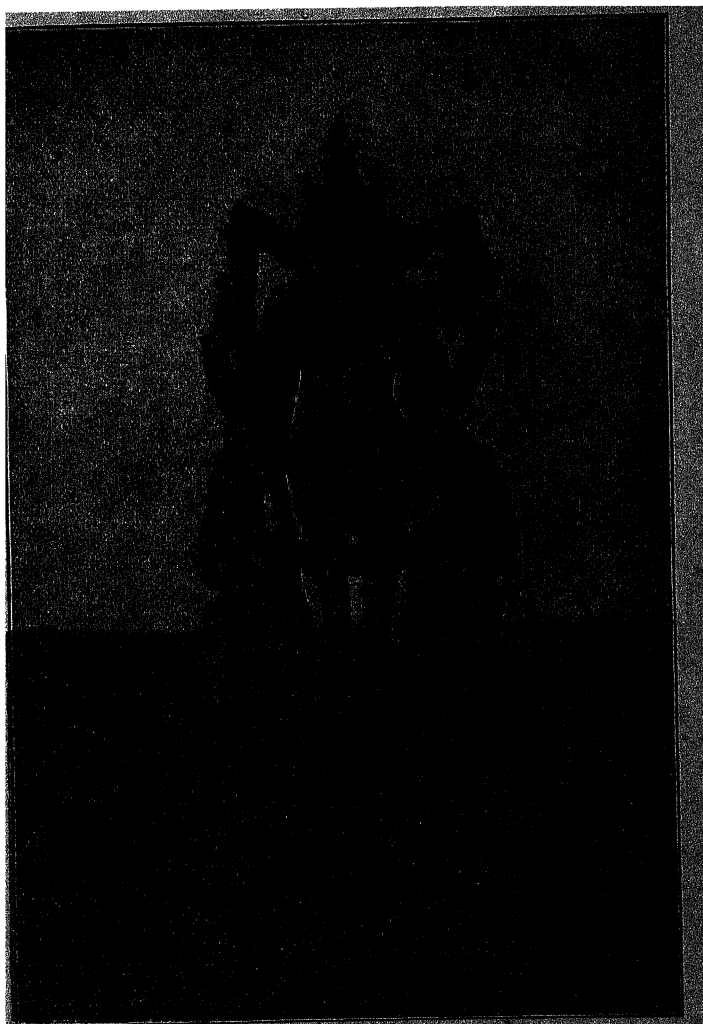
ফরিদপুর খাটুরার বাসুদেব মূর্ত্তি।

কেদার রায় শাক্ত এবং দশমহাবিদ্যার উপাসক ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি অদ্যাপি নদীয়া জেলার অন্তর্গত খরিয়া নিবাসী বৈদ্য-চৌধুরী মহাশয়গণের বাড়ীতে বিদ্যমান আছে। দেবীর পাদোপরি কেদার রায়ের নাম অঙ্কিত আছে। রায় রাজগণ প্রতিষ্ঠাপিত দশমহাবিদ্যা মূর্ত্তির ইহা অন্যতম। ধলছত্র গ্রামে কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠাপিত একটী গণেশ মূর্ত্তি অদ্যাপি যত্ন সহকারে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি।

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা মুন্সেফীর অন্তর্গত খাট্রাগ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের বাসুদেব পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধ। জনপ্রবাদ হইতে এবং ইঁহার সেবাইত গণের নিকট হইতে জানিতে পারা যায় যে ইহা চাঁদ-কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠাপিত। এই বাসুদেব মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বর্ত্তমান সেবাইতগণ বলেন যে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বন করিয়া তাঁহার মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুরের সহিত নানাদেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে পূর্ব্বাঞ্চলে ফরিদপুর জেলার অন্তঃর্গত মুগডোবা গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথাকার জনৈক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। তথায় রাত্রিতে আহারাদির পরে 'মুখশুদ্ধির, জন্য অতিরিক্ত হরিতকী প্রাপ্ত হ'ন। বিষ্ণুদাস ঠাকুর উক্ত হরিতকীর কিয়দংশ উত্তরীয়াঞ্চলে সঞ্চিত রাখেন, তদ্দর্শনে গৌরাঙ্গদেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন "মাতুল! আপনার এখনও সঞ্চয় বুদ্ধি দূর হইল না, অতএব আপনি সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুপযুক্ত। আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করি না, আপনি এ স্থানেই থাকুন। কিছুকাল পরেই ৺ শ্রীবাসুদেব বিগ্রহের বৃত্তান্ত স্বপ্নে অবগত হইয়া উক্ত বিগ্রহ এইস্থানে আনয়ন করিতে পারিবেন। আপনার দুইটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইবে, ঐশ্বর্য্যশালী

ফরিদপুর খাট্রার বাসুদেব মূর্ত্তি।

হইয়া আপনি এ স্থানেই মৃত্যু পর্য্যন্ত বাস করিবেন। উক্ত বিগ্রহ আনীত হইলে আমি এ স্থানে আসিয়া তাহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য এবং পূজা ও ভোগের নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিব। গৌরাঙ্গদেব এরূপ বলিয়া মাতুলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে বিষ্ণুদাস ঠাকুর স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন যে 'আমি চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের দীর্ঘিকার মধ্যে অবস্থান করিতেছি, আমাকে শীঘ্র লইয়া যাও। এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া তৎপর দিবসই বিষ্ণুদাস ঠাকুর বহু লোক সঙ্গে তথায় গমন করতঃ পবিত্র ব্রাহ্ম-মূহুর্ত্তে দীর্ঘিকার এক প্রান্তে অবতরণ করিয়া হস্তদ্বয় প্রসারণ করিবামাত্রই নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে হস্তের উপর বাসুদেব মূর্ত্তি বিরাজমান। চাঁদ রায় ও কেদার রায় এই অলৌকিক বিবরণ জ্ঞাত হইয়া উক্ত বিগ্রহের সহিত ঠাকুরকে নিজ বাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সপ্তাহ কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিবার পর রায় ভ্রাতৃদ্বয় স্বপ্নে দেখিলেন যে বাসুদেব ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন "আমাকে শীঘ্র মুগ্‌ডোবা পাঠাও নচেৎ অচিরকাল মধ্যে তোমার বংশনাশ হইবে।" চাঁদ রায় ও কেদার রায় স্বপ্নাদেশে ভীত হইয়া বিগ্রহের সহিত বিষ্ণুদাস ঠাকুরকে মুগ্‌ডোবা পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর বিষ্ণুদাস ঠাকুর সপ্তাহকাল মুগডোবায় বাস করিলে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব, পূর্ণানন্দ সরস্বতী ও ব্রহ্মানন্দ গিরি একত্রে উক্ত গ্রামে আসিয়া ৺ বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার নিয়মাবলী বর্ণন করতঃ উৎকল দেশে প্রস্থান করেন। তদবধি বিষ্ণুদাস ঠাকুর যথা নিয়মে বিগ্রহের পূজাদি কার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং তাহার বংশধরগণও পূর্ব্ব নিয়মেই পূজাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন।

দ্বিতীয় কিংবদন্তী এই যে এই বাসুদেব বিগ্রহকে ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী রামপাল গ্রাম নিবাসী কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের দীর্ঘিকাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখন এই মূর্ত্তিটির ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করা যাউক। প্রথমোক্ত কিংবদন্তী হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের 'মুগডোবা' আগমনের বিষয় প্রমাণিত হইতেছে। এক্ষণে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন্ সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন? তাঁহার আবির্ভাব কাল ১৪০৭শকে (১৪৮৫ খ্রীঃ অঃ) ও তিরোভাবের কাল ১৪৫৪শকে (১৫৩২ খ্রীঃ অঃ)। অতএব যদি তিনি পূর্ব্বাঞ্চলে আগমন করিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চিতই উহা ১৫১৫ খ্রীঃ হইতে ১৫৩২ খ্রীঃ মধ্যবর্ত্তী সময়ের হইবে। সে সময়ে চাঁদ রায় কেদার রায়ের প্রাধান্যের প্রথম অবস্থা। রায় ভ্রাতৃদ্বয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই কাল-কবলে নিপতিত হ'ন। কেদার রায় মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া ১৬০২—৬ খ্রীঃ অঃ পরলোক গমন করেন। চাঁদ রায় তাঁহার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় চাঁদরায় কেদার রায় বিষ্ণুদাস ঠাকুরকে বিগ্রহসহ কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন এরূপ-জন-প্রবাদ কোনরূপে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে মুগডোবা আগমন করিয়া ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে সে সময়ে চাঁদ রায় কেদার রায় উভয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে বিপুল সন্দেহ, আর যদি জন্মগ্রহণ করিয়াও থাকেন তাহা হইলেও তাঁহারা যে তখন তরুণ বালক মাত্র ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কি কোন কারণ আছে? অতএব মুগডোবার বাসুদেবমূর্ত্তির সহিত চাঁদ রায় কেদার রায়ের নাম কাল-বশে কল্পনা-প্রিয় নর নারীর দ্বারা অনাবশ্যকরূপে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্যই নিহিত নাই—যাহা আছে তাহা অলীক জন-প্রবাদ মাত্র। এ কিংবদন্তীতে ইহাও প্রকাশ যে কেদারপুর গ্রামের দীর্ঘিকা মধ্য হইতে

মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছিল, এ জন প্রবাদও আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা, কারণ কেদারপুর গ্রামে কেদার রায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, অদৃষ্ট বৈগুণ্যে তাহার সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই, স্তূপীকৃত ইষ্টক রাশি, পরিখা-সংযুক্ত বাটীর চিহ্ন অদ্যাপি সে কাহিনীর ক্ষীণ-স্মৃতি বহন করিতেছে। আড়াফুলবাড়িয়া বা শ্রীপুরই তাঁহাদের প্রাচীন ও প্রকৃত রাজধানী এবং ঐ গ্রামেই তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা প্রথম আগমন করিয়া বাসাবাটী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করেন চাঁদ রায় কেদার রায়ও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীপুরেরই অধিবাসী ছিলেন তাঁহারা কেদারপুরে কোন দিনই বাস করেন নাই, সবে বাটী নির্ম্মাণ হইতেছিল, অতএব চাঁদ রায় কেদার রায় কর্ত্তৃক বিষ্ণুদাস ঠাকুরের নিগ্রহ এবং কেদারপুরের দীর্ঘিকা হইতে থাটরার বাসুদেব মূর্ত্তির প্রাপ্তি সংবাদ সম্পূর্ণ অলীক জন-প্রবাদ বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় কিংবদন্তীর মধ্যেই প্রকৃত সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। এই কিংবদন্তী হইতেই প্রকাশ রামপালের দীঘি হইতে মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। অজ্ঞতা নিবন্ধন রামপালকে কেদার রায় চাঁদ রায়ের বাস-পল্লীরূপে অভিহিত করা হইয়াছে, রামপাল চাঁদ রায় কেদার রায়ের রাজধানী নহে, উহা বল্লাল সেন প্রমুখ সেন বংশীয় রাজন্যগণের অধিকৃত সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী। উহা সর্ব্বজন বিদিত, অতএব এই পরস্পর বিদ্বেষী কিংবদন্তী দুইটীর আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে বিষ্ণুদাস ঠাকুরের বংশধরগণ কিরূপ ভাবে কোন সময় এ মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছিল তাহার প্রকৃত ইতিহাস জ্ঞাত নহেন, সে জন্যই সামঞ্জস্য বিহীন কিংবদন্তী সমূহের উল্লেখ দ্বারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির সমক্ষে বিষম প্রমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিষ্ণু মূর্ত্তির পাদপীঠে "ভট্টপুত্র শ্রীপুরন্দর

দেবস্য” নামক যে ক্ষুদ্র খোদিত লিপিটি বিদ্যমান আছে, উহা হইতে মূর্ত্তিটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সময় নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা দেখিতে পাইতেছি, এখন তাহারি আলোচনা করিব।

৺ বাসুদেব বিগ্রহ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত, চতুর্ভুজ, দক্ষিণ দিকের প্রথম হস্তে গদা, দ্বিতীয় হস্তে চক্র বাম দিকের প্রথম হস্তে শঙ্খ। দ্বিতীয় হস্তে বনপুষ্প মালা। ইনি লম্বোদর, কটীদেশে কৌপীন, তদুপরি বর্হিবাস, কণ্ঠদেশে যজ্ঞোপবীত লম্ববান, দক্ষিণে শ্রী—বামে সরস্বতী। চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তির পুরাণোক্ত বর্ণনানুযায়ী ইনি ত্রিবিক্রম, উপেন্দ্র এবং বাসুদেব সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। বাসুদেব বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান, শতদল নিম্নে মনুষ্যাকৃতি গরুড় করযোড়ে জানুপাতিয়া উপবিষ্ট, লক্ষ্মী-সরস্বতীর পদ-নিম্নে ভক্ত-যুগল যোড়করে স্তব করিতেছে। প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়াই এই মূর্ত্তিটির প্রধান বিশেষত্ব, কারণ গরুড়ের দক্ষিণে ও বামে একটি খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়। গরুড়ের দক্ষিণে “ভট্ট পুত্রশ্রী” পর্য্যন্ত এবং বাম দিকে “পুরন্দর দেবস্য” একয়টি অক্ষর উৎকীর্ণ আছে। এই লিপির দ এবং ব ইহাকে সেনরাজাদিগের সময়ের লিপি বলিয়া ব্যক্ত করিতেছে, কিছু পরবর্ত্তী হওয়া ও অসম্ভব নহে। এখন কথা হইতেছে, যে ‘এই ভট্টপুত্র পুরন্দর দেব লোকটি কে? ইনিই কি ভাস্কর? না পূজক? কি মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাপয়িতা? এ তিনটির কোনটি? ‘দেবস্য’ এইরূপ লিখিত থাকায় ভট্টপুত্র শ্রীপুরন্দর দেবকে এ মূর্ত্তির অধিকারী বা প্রতিষ্ঠাপয়িতা রূপে গ্রহণ করিবার সপক্ষেই বিশ্বাস জন্মাইতেছে। অতীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন অন্ধকার হইতে এই পুণ্ডরীক ঠাকুরের প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত হইতে পরিলেই আমাদের সমুদয় সন্দেহ এক নিমিষে ভঞ্জন হইতে পারিত। এখন পর্য্যন্ত আমরা এমন কোন ক্ষীণ সূত্রও অবলম্বন করিতে পারি নাই যাহার সাহায্যে

ইহার প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কৃত হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত না তাহা পাইতেছি সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই মূক রহিতে হইবে। তক্ষণ-শিল্পের সৌন্দর্য্যানুভূতিও খোদিত লিপির প্রাচীনত্বের দ্বারা বিচার করিতে গেলে এ মূর্ত্তিটিকে ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অর্থাৎ সেনরাজগণের রাজত্বের শেষ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয়। নবম শতাব্দীর পরবর্ত্তী কাল হইতেই ভারতীয় তক্ষণ শিল্পের ক্রমিক অবনতি পরিলক্ষিত হয়, অতএব কারুকার্য্য-বিহীন প্রস্তর মূর্ত্তিকে কোনরূপেই ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বলিয়া অনুমান করিতে পারি না। কিংবদন্তী ইত্যাদির আলোচনা দ্বারা আমাদের প্রতীতি হইতেছে যে শেষোক্ত জন-প্রবাদটিই ঠিক্, রামপালের দীঘিকার মধ্যে ইহা প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, পরে কালবশে বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বহু প্রাচীন দেবদেবী মূর্ত্তি যেমন নানাস্থানে স্থানান্তরিত হইয়া ক্রমশঃই বিক্রমপুরের প্রকৃত ইতিহাস সংকলনের প্রধান অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে তদ্রূপ এ বাসুদেব মূর্ত্তিও যে কোনরূপেই হউক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে মুগ্‌ডোবা গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়া বিবিধ কিংবদন্তীর সৃষ্টি করিয়া মূল সত্যকে জনশ্রুতি-রাক্ষসীর বিরাট উদরে নিহিত করিয়া ফেলিয়াছে।

বাসুদেবঠাকুর জাগ্রত দেবতা বলিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের সর্ব্বত্র ইঁহার খ্যাতি বিদ্যমান। ১২৭৮-৭৯ সনে ভাঙ্গায় বাসুদেবের পালা লইয়া সেবাইতদের মোকদ্দমা হয়। মুগ্‌ডোবা হইতে খাট্‌রার আগত সরিকগণ ঐ মোকদ্দমা করেন, এ মোকদ্দমার শেষ মীমাংসা হাইকোর্ট হইতে সম্পাদিত হইয়াছিল।

আমরা এখানে বাসুদেব মূর্ত্তির চিত্র এবং তদীয় পদ নিম্নে খোদিত লিপির প্রতিলিপিও প্রদান করিলাম। * বিশেষ লক্ষ্য করিলে চিত্রের মধ্যেও

* ভাঙ্গার প্রথম মুন্সেফ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ বি এল মহাশয় এবং খাট্‌রা-নিবাসী ভাঙ্গার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এ মূর্ত্তির চিত্র ও বিবরণী সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। ফোটোগ্রাফ ভাল না হওয়ায় হাফ্‌টোন চিত্রও ভাল হয় নাই। অন্ধকার গৃহ মধ্যে কৃত্রিম আলো প্রজ্জ্বলিত করিয়া বাসুদেব ঠাকুরের চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে।
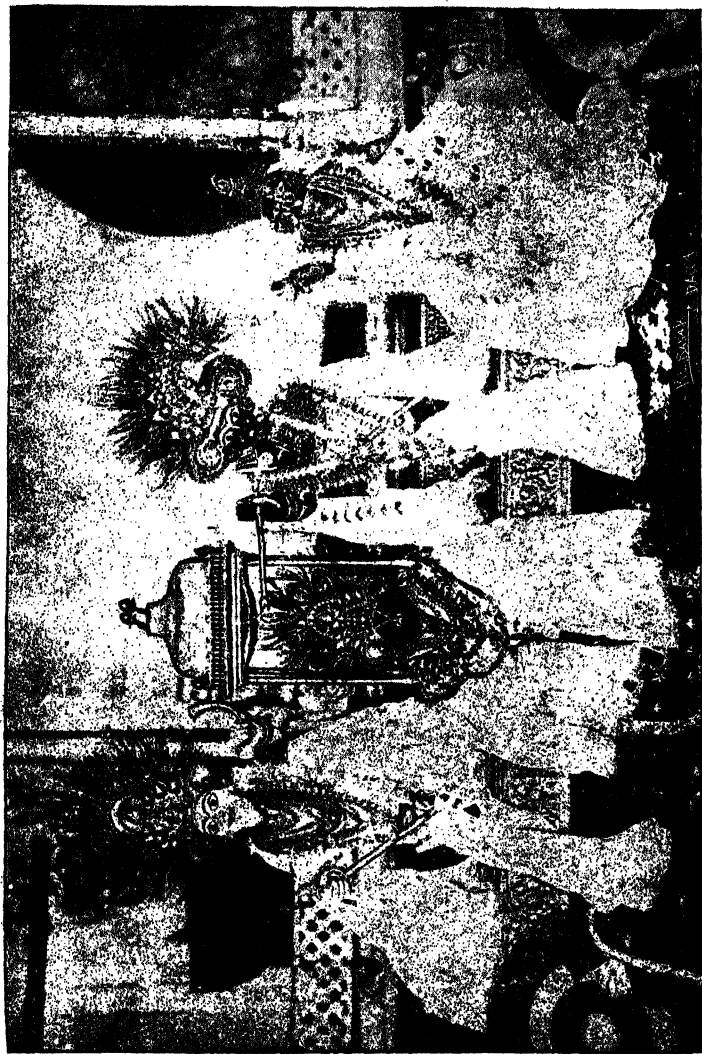
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ, ঢাকা।

খোদিত লিপির অক্ষর সমূহ দেখা যাইবে। বাসুদেব মূর্ত্তির বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীযুক্ত কালীকুমার বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁহাদের বংশাবলী পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। এই বংশাবলী হইতে জানিতে পারা যায় যে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুর দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম বিবাহ বৈদিক শ্রেণীর কন্যা, ইহার গর্ভজাত তিন পুত্র—শ্রীহরি, গোপালদাস, গোবিন্দ বিদ্যালঙ্কার। দ্বিতীয় বিবাহ রাঢ়ীয় শ্রেণীর কন্যা, ইঁহার গর্ভজাত সারদা নাম্নী এক কন্যা। বিষ্ণুদাস ঠাকুর হইতেই এই বংশের ফরিদপুর-মুগডোবায় বাস। মুগ্‌ডোবা আইরলখাঁর কুক্ষিগত হইবার পর হইতেই বিগ্রহ সহ বিষ্ণুদাস ঠাকুরের বর্ত্তমান বংশধরগণ খাট্‌রা লোচনগঞ্জে বাস করিতেছেন।

ঢাকা নবাবপুরের ৺লক্ষ্মীনারায়ণ।

কেদার রায়েয় অধঃপতনের পর তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত দেব-দেবীর মূর্ত্তি-সমূহ নানাস্থানে নানারূপে স্থানান্তরিত হয়। নবাবপুরের ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রও (শালগ্রাম) কেদার রায়ের কুলদেবতা রূপে প্রতিষ্ঠাপিত ছিলেন। (জন্মযাত্রোপখ্যান বা ঢাকা নগরীস্থ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রার ইতিহাসাদি বিবরণ নামক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে "চাঁদরায়, কেদার রায় নামক দেশীয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ভূম্যধিকারী ভ্রাতৃদ্বয় যাঁহারা বঙ্গীয় দ্বাদশ ভূস্বামীর (বারভূঞা) শিরোমণি হইয়া উন্নতাবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এমন কি তাহারা বঙ্গের আক্রমণকারী দিল্লীশ্বরের সেনাপতি মানসিংহাদি ও পর্ত্তুগীজ গঞ্জালীস প্রভৃতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। তৎপর উক্ত ভূপালদ্বয় স্বীয় গুরুদেব অগ্নিকল্প ব্রহ্মাণ্ড-গিরি মহাশয়ের (যাহাকে সাধারণে গোঁসাই ভট্টাচার্য্য বলিতেন) অভিশাপে সবংশে ধ্বংস প্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহাদি ঐ মহা

* শ্রীযদুনাথ বসাক মুচ্ছদ্দি প্রণীত।

সাধকের শাপের পরিণাম স্বরূপ দগ্ধ হইয়াগিয়াছিল। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ কেদারবাটী ও পোড়াগাছা নামক গ্রামদ্বয় অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে।”

কালক্রমে উক্ত ভূম্যধিকারীদের বংশাদি লুপ্ত প্রায় হইলে তাহাদের প্রতিষ্ঠাপিত দেবদেবী প্রতিমা সকল ও কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র (শালগ্রাম) ইত্যাদি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তৎপর কিছুকাল অতীত হইলে শেষোক্ত রাজর্ষি বাঞ্ছিত শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র এতদ্দেশে অর্থাৎ ঢাকানগরীতে শুভাগমন করিয়া ইহাকে পবিত্র করিয়াছেন।' * * বঙ্গাব্দ ৯৮২ সালে পূর্ব্ব কথিত চাঁদরায় ও কেদার রায়ের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র ইচ্ছাময় স্বয়ং স্বপ্নাদেশ করিলে তাঁহার পূজক ব্রাহ্মণ শালগ্রাম চক্র লইয়া ঢাকায় উপস্থিত হইয়া উক্ত দেওয়ান পুণ্যাত্মা কৃষ্ণদাস মুচ্ছদ্দি মহাশয়ের সন্নিধানে রাখিয়া আপনার জন্মজন্মান্তরীণ সাধন ও পুণ্যফলে প্রভুজিউ আপনারই হইলেন বলিয়া অর্পণ করেন। কৃষ্ণদাসও প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে শালগ্রামশিলার ভার গ্রহণ করেন। সেই হইতেই কৃষ্ণদাস মুচ্ছদ্দি মহাশয়ের উন্নতি হইতে আরম্ভ করিল।' কৃষ্ণদাস মুছদ্দিই ঢাকার বিখ্যাত জন্মযাত্রার উৎসবের প্রচার করেন। ৺লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা প্রবর্ত্তিত হয়।

সিদ্ধেশ্বরীর কালীবাড়ী।

“ঢাকা নগরীর উত্তরাংশে, বর্ত্তমান নিউটাউনের সন্নিকটে, মালীবাগ নামক স্থানে সিদ্ধেশ্বরীদেবীর মন্দির অবস্থিত। এই কালীমূর্ত্তি বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। মন্দিরের প্রাঙ্গণমধ্যে একটী রক্তচন্দন বৃক্ষ স্বীয় গৌরবোন্নত মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চন্দন-বৃক্ষ মন্দিরের সমীপবর্ত্তী আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।” * * * প্রবাদ এই যে, সিদ্ধেশ্বরীর জনৈক সেবাইত সৌমারবন গোস্বামী একজন

সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী (ঢাকা)।

স্বয়ং সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি এই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করেন। একদা এই মহাত্মা দেবীর প্রাঙ্গণ মধ্যস্থিত একটী ইন্দারা মধ্যে লৌহ শৃঙ্খল সহযোগে অবতরণ করেন; তিনি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যদি এই শৃঙ্খল কূপজলের স্ফীতিহেতু নিমগ্ন হইয়া যায়, তবে তাঁহার মৃত্যু-হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যতকাল পর্য্যন্ত ইহা জলমগ্ন হইয়া না যাইবে ততকাল পর্য্যন্ত তিনি জীবিত থাকিবেন। বর্ষাকালে স্থানীয় কূপ সমূহে জল বৃদ্ধি হইলেও এই কূপের জলরাশির কিঞ্চিন্মাত্রও স্ফীতি অনুভূত হয় না। এই শৃঙ্খলটি অদ্যাপি একই অবস্থায় কূপ মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে।'

শারদীয় উৎসবের সময়ে দেবীর সন্মুখে ঘট স্থাপনা করিয়া পূজা দিবার প্রথা বহুকাল হইতেই এখানে প্রচলিত আছে। পূজা সমাপনান্তে বিজয়াদশমীতে পূজারিগণ এই ঘট প্রাঙ্গণ মধ্যস্থিত পুস্করিণীতে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। ফাল্গুন মাসের অষ্টমী তিথিতে এই ঘট পুনরায় জাগিয়া উঠে। পরে ঐ ঘট পুনরায় স্থাপন পূর্ব্বক দশাহ পর্য্যন্ত পূজা হইয়া বিসর্জ্জিত হয়। প্রতি বৎসরই এইরূপে পূজা হইয়া থাকে।

'শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের 'বন' উপাধিধারী' উদাসীনগণই এই মঠের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। নিম্নে দেবীর সেবাইত গণের সমানুক্রমিক নাম প্রদত্ত হইল ঃ—

সোমার বন গোস্বামী
এৎবার বন গোস্বামী (চেলা)
রামেশ্বর গোস্বামী (চেলা)
সুমের-বন গোস্বামী (পুত্র)
নরসিংহ গোস্বামী (জীবিত)'

ঢাকার ইতিহাস—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়

চাঁদরায়ের কীর্ত্তি অদ্যাপিও ঢাকা,ত্রিপুরা ইত্যাদি নানা জেলায় বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। রায়গণ শাক্ত ছিলেন। দশমহাবিদ্যার প্রতিষ্ঠা ও তাহারা বিক্রমপুরে করিয়াছিলেন, এরূপ স্থলে সিদ্ধেশ্বরী দেবী ও তাহাদের প্রতিষ্ঠাপিতা একথা অসম্ভব মনে হয় না। পঁচিশ ছাব্বিশবৎসর পূর্ব্বে আমরা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির যেরূপ বনাকীর্ণ নির্জ্জন ভূমিতে দেখিয়াছি এখন আর তেমন নাই, নূতন সহরের অভ্যুদয়ে সে নীরবতা দূরে চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এখানে দিবাভাগে আসিতেও কেমন একটা শঙ্কার উদয় হইত, তখন ইহার সম্বন্ধে কত যে অলৌকিক কিংবদন্তী ও গল্প-গাথা শুনিয়াছি, তাহা আর এখন ভাল করিয়া মনেও পড়েনা।

চাঁদরায় সোণামণির অপহরণ ঘটিত মর্ম্ম বেদনায় দারুণ মনস্তাপে আনুমানিক ১৫৯০-৯৫ খ্রীঃ অঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হ'ন, তদনুযায়ী হিসাব করিতে গেলে এই মন্দির ও দেবী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১১৭২ সনের ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে সুমের-বন গোস্বামী ঢাকা ফুলবাড়িয়ার গোপাললোচন মিত্র বরাবরে যে একখানা কবুলিয়ত সম্পাদন করিয়া দেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, খিলগ্রাম মৌজার মধ্যে ৪৪০৷৮৪৷১০ চারি শত চল্লিশ বিঘা উনিশ কাঠা দশধুর জমি "শ্রীশ্রী৺ সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী ও শ্রীশ্রী৺ মহাদেব ঠাকুর বিগ্রহের দেবোত্তর নাখেরাজ সম্পত্তি ভুক্ত।' *

জয়পুরের শিলাদেবী।

মহাকবি ভারতচন্দ্রের কবিতা পাঠে সকলই জানেন "শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁরধামে অভয়া যশোরেশ্বরী। পাপেতে ফিরিয়া বসিল রুষিয়া তাহারে অকৃপা করি॥ এই শিলাদেবী সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। জয়পুর কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

* ঢাকার ইতিহাস-পৃঃ ৩৭৪ ১খণ্ড।

লিখিত এবং "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রে, প্রকাশিত বিদ্যাধর শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সকলেরি ধারণা ছিল যে অম্বরের শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যের 'যশোরেশ্বরী'। মেঘনাদ বাবুও কেদার রায়ের পরিচয় অবগত না থাকায় লিখিয়াছিলেন "কেদার রায় = পরতাপদীপ = প্রতাপাদিত্য, এইরূপ বুঝিলে সকল গোল মিটিয়া যায়।" এই ভ্রম-সংশোধনের জন্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয়ের অনুমানই সুসঙ্গত তিনি বলেন "কেদার রায়কে আমরা প্রতাপাদিত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি বারভূঞার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায়। অম্বরের শিলাদেবী যে প্রতাপাদিত্যের নহেন কেদাররায়ের সে সম্বন্ধে স্থির মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। * শিলাদেবী অষ্টভুজা দুর্গামূর্ত্তি। দেবীর অর্চ্চনার জন্য রাজা মানসিংহের সহিত বিক্রমপুরবাসী যে বৈদিক ব্রাহ্মণ অম্বর গমন করেন তাঁহার নাম রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম। অদ্যাপি ইঁহার বংশধরগণ আপনাদিগকে বঙ্গদেশবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বংশপরম্পরাগত ভাবে রাজপুত ব্রাহ্মণগণের সহিত আদান-প্রদান করিয়া এক্ষণে ইহারা রাজপুতনার ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন। শিলাদেবীর সম্বন্ধে জয়পুর অঞ্চলে একটী গাথা প্রচলিত আছে, সে গাথাটি এই,—

সাঙ্গানের কা সাঙ্গাবাবা জয়পুরকা হনুমান্।
আম্বেরকা সল্লাদেবী লায়া রাজামান॥"

ইহা হইতেও শিলাদেবী যে বাঙ্গলা দেশ হইতে নীত হইয়াছিলেন সে সন্দেহ নিরাকৃত হয়। "আর একটী প্রবাদ বাক্যানুসারেও প্রমাণিত হয় যে, শিলাময়ী দেবী চাঁদরায়েরই গৃহদেবী ছিলেন। কথাটি এই। রাজা মানসিংহ বিক্রমপুরাধিপতিকে জয় করিয়া গৃহদেবী শিলাময়ী লইয়া

* এই মীমাংসার জন্য ৺ মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় এবং বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট বঙ্গভাষা বিশেষ ঋণী।

ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। পরে তত্রত্য কর্ম্মকারগণকে ঠিক্ ঐ মূর্ত্তির অনুরূপ অন্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ জন্য নিয়োগ করিয়া, তাহারা পাছে কোনরূপে দ্রব্যের অসদ্ব্যবহার বা অপহরণ করে এইজন্য সর্ব্বদা রক্ষিগণকে তত্ত্বতালাস লইতে নিযুক্ত করা হয়। কর্ম্মকারেরা নিয়ত শিলাময়ীর নিকট থাকিয়া অন্য প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। যে দিবস কার্য্য শেষ হয়, সে দিবস তাহারা রাজ-সদনে উপস্থিত হইয়া বলে "মহারাজ আমরা একবার এই নব নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তিকে পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া আনিতে ইচ্ছা করি।" রাজা তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইলে নির্ম্মাতারা অলক্ষিতে তাহাদের নির্ম্মিত পিতলের মূর্ত্তিটিকে দেবীর আসনোপরি রাখিয়া যথার্থ দেবীমূর্ত্তিকে মাজিয়া ঘসিয়া স্নান করাইয়া লইয়া আইসে, পরে উভয় মূর্ত্তি একত্র হইলে কোনটি বা পূর্ব্ব নির্ম্মিত এবং কোনটি বা নবনির্ম্মিত কেহই তাহা নির্ব্বাচণ করিতে পারিলেন না। পরে কারিকরেরা এই রহস্য জনক ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দিলে মানসিংহ তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়া, চাঁদরায়ের দেবীকে জয়পুর লইয়া যান এবং অপর মূর্ত্তিটি ঢাকাতে সংস্থাপিত করেন। উহাই ঢাকেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ উভয় মূর্ত্তিই অষ্টধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল কিংবদন্তীর সহিত জয়পুরের প্রাপ্ত ইতিহাসের সমন্বয় সাধন করিলে, শিলাময়ী প্রতাপাদিত্যের না হইয়া কেদাররায়ের হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। *

বিক্রমপুরের নানাগ্রামেও চাঁদরায় কেদাররায়ের বহু কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। বাঘরার চাঁদরায়ের দীঘিও অন্যতম। চাঁদরায়ের দীঘি একটী সুবৃহৎ জলাশয় ছিল, ঐ জলাশয় হইতেই বাঘরার বিখ্যাত বাসুদেবমূর্ত্তি

* বারভূঞা—শ্রীআনন্দনাথ রায়। ৮৬—৮৭ পৃষ্ঠায়।

পাওয়া গিয়াছিল; ঐ দীঘিটি এখন আর বিগুমান নাই। ত্রিপুরা জেলায়ও চাঁদরায়ের বহু কীর্ত্তি বিরাজিত ছিল—বর্ত্তমান চাঁদপুর-চাঁদরায়ের কীর্ত্তি স্বরূপ অদ্যাপি বিগুমান আছে। চাঁদরায়ের নাম অনুযায়ী উহার নাম চাঁদপুর হইয়াছে। চাঁদপুর বর্ত্তমান ত্রিপুরা জিলার একটী সবডিভিজন মেঘনার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত।

চাঁদরায়ের দীঘি চাঁদপুর ইত্যাদি।

কেদাররায় আশ্রিতবৎসল ও গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা-পরোপকার ইত্যাদি সম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আমরা এখানে উক্ত রাজসরকারের মুদী (রসদ সংগ্রহকারী) রাঘবেশ্বর পাল (মণ্ডল) সম্বন্ধে যে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে তাহার উল্লেখ করিলাম। কথিত আছে রাঘবেশ্বর সুশ্রী ও বুদ্ধিমান বলিয়া রাজার বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন। মহিষী ও পুরাঙ্গনাগণ ও তাঁহাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। একবার কোনও ব্যাপার উপলক্ষে মহিষী ও রাজ-পরিবারস্থ মহিলাগণ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করাতে রাঘবেশ্বর তাঁহার পত্নীকে রাজ-ভবনে আনিতে দেন। রাঘবেশ্বরের পত্নী রূপবতী ছিলেন না, পরন্তু রাঘবেশ্বর অতি ধর্ম্ম-ভীরু লোক ছিলেন বলিয়া রসদ সংগ্রহ কার্য্যেও রাজবাটী হইতে অনুচিত অর্থোপার্জ্জন দ্বারা স্বকীয় আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে পারেন নাই। অতএব পুররমণীগণ সমীপে উপস্থিত হইতে পারে তদনুরূপ অলঙ্কারাদি ও তাহার পত্নীর ছিল না। এতন্নিবন্ধন তাহার স্ত্রীকে রাজ-পরিবারে পাঠাইতে রাঘব সবিশেষ আপত্তি করেন। কিন্তু তাহার আপত্তি খাটিল না। রাঘবেশ্বরের পত্নীকে দেখিয়া মহিষী ও পুরাঙ্গনাগণ বাস্তবিকই সুখী হইতে পারেন নাই। ক্রমে তাহার কুরূপের কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা ও

রাঘব মণ্ডল।

তৎপরিবারবর্গ রাঘবেশ্বরকে পুনরায় একটী সুশ্রী পাত্রী দেখিয়া তৎপাণি-গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করিলেন। তৎকালে বহু বিবাহ সামাজিক হিসাবে দোষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। রাঘবেশ্বর এই প্রস্তাবে প্রথমতঃ স্বীকৃত হইতে পারেন নাই। কারণ তখন তাহার বয়স অধিক হইয়াছিল, এই বয়সে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করা তিনি যুক্তি-যুক্ত বোধ করেন নাই। কিন্তু রাজানুরোধ উপেক্ষণীয় নহে, কাজেই তাহাকে পরিশেষে বাধ্য হইয়া ঐ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে হইয়াছিল।

রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী কোন দরিদ্র তিলিবংশীয় গৃহস্থের একটী রূপবতী কন্যা ছিল। সকলেরই ঐ কন্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হইল, রাঘবেশ্বরকে এরূপ পরামর্শ দেওয়া হইল যে বালিকাটি যখন স্নান করিবার জন্য রাজবাটীর পুষ্করিণীতে আসিবে তখন রাঘবেশ্বর স্নান ব্যাপদেশে তথায় গমন পূর্ব্বক বালিকার নিকটস্থ হইয়া উভয়ের মাথায় জল ঢালিয়া দিবে। দেশ-প্রথানুসারে এইরূপ করিলে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ করা হয়।

এক দিবস সেই বালিকা তাহার পিতামহীর সঙ্গে স্নান করিতে গেলে, রাঘবেশ্বর সেই সুযোগ অবলম্বনে যথাকথিত প্রথানুসারে উহাকে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ করেন। বালিকার পিতা রাজ সমীপে এই বিষয়ে রাঘবেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। রাজা রাঘবেশ্বরের সহিত সেই বালিকার প্রচলিত প্রথানুসারে প্রাজ-পত্য বিবাহ প্রদান করিয়া এই বিষয়ের মীমাংসা করেন। এবং উক্ত কন্যার গর্ভজাত সন্তান ও তাহাদের বংশধরগণের সুখ-স্বচ্ছন্দে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কথিত আছে উক্ত ঘটনার পর রাঘবেশ্বর রাজ-সমীপে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া সসম্মানে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। অতঃপর রাঘবেশ্বর, মণ্ডল খিতাবী প্রাপ্ত

হয়েন এবং কাড়িয়া বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে এবং তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানও তাহাদের বংশধরগণকে কাড়ামণ্ডল বলা হয়। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে মাথায় জল ঢালিবার সময় অন্য বাদ্য-যন্ত্রের অভাবে কাড়াবাজান হইয়াছিল বলিয়া 'কাড়া মণ্ডল' কহে।

রাঘবেশ্বরের প্রথমাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ ও তাহাদের বংশধরগণ পাল বলিয়া খ্যাত। ইহাদের এক শাখা বাঘিয়া ও আবদুল্লাপুর গ্রামে বিশেষ সম্পন্ন অবস্থায় আছে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানও তাহাদের বংশধরগণ মণ্ডল বলিয়া খ্যাত। উহাদের এক শাখাও আবদুল্লাপুর গ্রামে বিশেষ সঙ্গতিপন্ন অবস্থায় আছে। এই উভয় বংশ বিক্রমপুরস্থ আবদুল্লাপুর, বাঘিয়া, রাজাবাড়ী ও বহর প্রভৃতি গ্রামে প্রায় সকলেই বিশেষ সমৃদ্ধ অবস্থায় বাস করিতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গুরু-পুরোহিত ও বিবিধ কিংবদন্তী।

এ অধ্যায়ে আমরা রায়রাজগণের গুরু-পুরোহিত বংশের পরিচয় ও অন্যান্য বিবিধ কিংবদন্তী সমূহের আলোচনা করিব। গোঁসাই ভট্টাচার্য্য চাঁদরায় কেদাররায়ের গুরু ছিলেন। ইনি সিদ্ধ শ্রোত্রিয় কুলোদ্ভব, তৎকাল প্রচলিত বীরাচারি তান্ত্রিক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। সে যুগে পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই শক্তি-মন্ত্র প্রচলিত ছিল বিশেষ স্থানীয় রাজা মহারাজারাও প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা উক্ত মন্ত্রেই দীক্ষিত হইতেন। এই মহাত্মার সম্বন্ধে নানাপ্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা এস্থানে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিলাম।

গুরু-পরিচয় গোঁসাই ভট্টাচার্য্য।

একবার অশোকাষ্টমী ব্রতোপলক্ষে কেদাররায় গুরুদেব সহ ব্রহ্মপুত্র স্নানে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন যে 'তোমার সেখানে যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই, তোমার রাজধানীর পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া যে মেঘনাদ (মেঘনা) নদ প্রবাহিত হইতেছে উহাতে স্নান করিলেই তোমার সে ফল লাভ হইবে।' মহারাজ ইহাতে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিলে গোসাঞি নিজ সম্মুখস্থ একটী কমলালেবু উত্তোলন করিয়া বলিলেন যে তুমি এই লেবুটি গ্রহণ কর এবং ইহা নদ বক্ষে নিক্ষেপ কর, যে স্থান হইতে স্বয়ং ব্রহ্মপুত্রদেব হস্ত উত্তোলন করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন জানিও সে স্থান পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত আছে। রাজা গুরুদেবের আদেশানুযায়ী উহা লাঙ্গলবন্ধের কিছুদূরে পঞ্চমীঘাট নামক

স্থানে নিক্ষেপ করিলেন, লেবুট স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিল, রাজাও তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৌকারোহনে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কমলা লেবুটি ভাসিতে ভাসিতে কাৰ্ত্তিকপুরের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত মেঘনার একটী ঘোলার মধ্যে পড়িয়া ঘুরিতে লাগিল কেদাররায়ও সেইস্থানে নৌকা রাখিয়া দিলেন। দেশের সর্ব্বত্র এই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় দলে দলে লোক নদীর তীরে সমবেত হইতে লাগিল, পরে যখন মধু শুক্লাষ্টমী তিথির আবির্ভাব হইল তখন তীরবর্ত্তী কৌতূহলী নর নারী বিস্মিত নেত্রে দেখিতে পাইল যে নদীগর্ভ হইতে দিব্যালঙ্কার ভূষিত এক মূৰ্ত্তি আবিভূর্ত হইলেন, এদিকে গোসাঞি ভট্টাচার্য্য ও নদীগর্ভ হইতে কমলালেবুটি উত্তোলন করিয়া মূৰ্ত্তির হস্তে অর্পণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে মূৰ্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। এই ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হইয়া ভক্তি-পূর্ণচিত্তে ঐ জলে স্নান করিয়া ব্রহ্মপুত্র নীরে স্নান করিবার ফল লাভ করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে ঐস্থান কমলাপুর নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপি অশোকাষ্টমীর দিবসে প্রতিবর্ষে বহুসংখ্যক যাত্রী এস্থানে অবগাহন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। প্রকৃত কমলাপুর বহুদিন হইল মেঘনার উদরস্থ হইয়া বহু পশ্চিমে সরিয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্তই লালা রামগতিরায় তৎপ্রণীত 'মায়া তিমির চন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থে বিক্রমপুরের সীমা বর্ণনায় পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী মেঘনাদ নদের নামের স্থানে ব্রহ্মপুত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

'মহাতীর্থ ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌গুণী বিস্তর॥

৺কালীপূজাউপলক্ষে মৃন্ময়ী কালীমূর্ত্তি পূজার্থ কেদাররায়ের বাটীতে আনীত হইলে গোসাঞি ভট্টাচার্য্য দেবীর পূজা করিবার জন্য তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে উপনীত হইলেন, রায় ভ্রাতৃদ্বয়ত দেখিয়া অবাক্! তাঁহারা বলিলেন "ঠাকুর মহাশয়, আপনাকে দেবীর পূজা করিতে হইবে, আপনার উপবাসী থাকা প্রয়োজন, কিন্তু একি! আপনি যে পান চিবাইতেছেন? ইহাতে কি আর প্রকৃত পূজা হয়?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—'আমার ভোজনে কোন দোষ নাই দেখিও এই মৃন্ময়ী মূর্ত্তির মধ্যেই দেবীর আবির্ভাব হইবে।' শিষ্যেরা বলিলেন 'তাহার প্রমাণ কিরূপে পাইব। গুরু বলিলেন তাহাও দেখিতে পাইবে।' অনন্তর পূজায় উপবেশন করিয়া ভট্টাচার্য্য যেমন কালীর জানুদেশে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন অমনি সেইস্থান দিয়া ঝলকে ঝলকে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, সকলে দেখিয়া অবাক্ হইলেন।

তান্ত্রিকেরা মদ্যপায়ী। গোসাঞি ভট্টাচার্য্য তন্ত্র-মন্ত্রের উপাসক কাজেই ঘোরতর মদ্যপায়ী ছিলেন। একবার চাঁদ কেদাররায়ের বাটী হইতে ফিরিবার পথে এক শৌণ্ডিকালয়ে গমন করিয়া আকণ্ঠ পুরিয়া মদ্যপান করিলেন; শুঁড়ি পয়সা চাহিলে বলিলেন যে আমি সূর্য্যদেব মাথার উপর থাকিতে থাকিতেই অর্থ আনিয়া দিব। ভট্টাচার্য্য চলিয়া গেলেন। প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু ভট্টাচার্য্যের দেখা নাই তখন পয়সা প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া শৌণ্ডিক:রাজ-দরবারে আসিয়া সমুদয় বিবৃত করিলে—চাঁদরায় কেদাররায় তাহাকে প্রাপ্য মুদ্রা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শৌণ্ডিক ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঠাকুর অর্থ হস্তে দণ্ডায়মান। সে ব্যক্তি প্রাপ্য মূল্য গ্রহণ করা মাত্রই ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিলেন। কিন্তু একি অদ্ভুত ঘটনা! তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই নক্ষত্র-খচিত গভীর অন্ধকারময়ী রজনীর আবির্ভাব হইল দ্বিপ্রহরের

প্রদীপ্ত সূর্য্য কেমন করিয়া কোথায় প্রস্থান করিল তাহা শৌণ্ডিক বুঝিল না কেহই বুঝিতে পারিলেন না। গোসাঞি ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ বহু অলৌকিক গল্প অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এসব অতি প্রাকৃত ঘটনা সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা আমাদের মত অর্ব্বাচীনের পক্ষে অসম্ভব।

গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের প্রকৃত নাম রত্নগর্ভ। তিনি দুই বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ঐ দুই স্ত্রীকে ৺কালীপূজা করিবার নিমিত্ত দুইখানা অষ্টধাতুনির্ম্মিত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, বড় স্ত্রীর যন্ত্রখানা বড় এবং কনিষ্ঠা পত্নীর যন্ত্রখানা ছোট।

গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের প্রথমা পত্নীর কোনও পুত্রসন্তান জন্মে নাই, তাঁহার গর্ভে একটীমাত্র কন্যা জন্মে, সেই কন্যার বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে বেলপুকুরিয়ার ঠাকুর নামে খ্যাত। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভেও কেবল মাত্র একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল—তাঁহার নাম রামভদ্র ভট্টাচার্য্য; এই রামভদ্রের নামানুযায়ী তদীয় বাস গ্রামের নাম রামভদ্রপুর হইয়াছে। রামভদ্র ভট্টাচার্য্যের তিন পুত্র (১) রাজীব লোচন (২) রামজীবন (৩) রামনাথ। রাজীব লোচনের বংশধর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোসাঞি ভট্টাচার্য্য হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ—তিনি এখন প্রাচীন ও স্থবির। রামজীবনের বংশধরগণ (১) শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য (২) রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা দুই ভ্রাতাও অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন ইঁহারা গোসাঞি ভট্টাচার্য্যর অধস্তন দশম পুরুষ। তৃতীয় রামনাথের বংশধর উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য এখন কাশীবাসী। কেদাররায়ের প্রদত্ত গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মোত্তর রামভদ্রপুর, সাজনপুর, সদেপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহ অদ্যাপিও তাঁহার বংশধরগণেরই অধিকারভুক্ত আছে। রামভদ্রপুরে গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণের নিকট হইতে অবগত

হইলাম যে পূর্ব্বে এস্থানে একটী ক্ষীরাই গাছ ছিল, প্রত্যহ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজার সময় ঐ বৃক্ষ হইতে একটী করিয়া ক্ষীরাই ৺কালীমাতাকে উপহার দিতেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতাও ঐ গাছে ক্ষীরাই ফলিতে দেখিয়াছেন। এখন ঐ গাছটি মৃত, কেবল উহার একটুকু চিহ্ন বিদ্যমান আছে। রামভদ্রপুরের ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ ঐ ক্ষীরাই গাছের গোড়াটি অতি যত্নের সহিত বেড়া দিয়া রাখিয়াছেন।

ভট্টাচার্য্যের প্রথমা স্ত্রী রায়ের ঝি ও দ্বিতীয়া স্ত্রী খাঁয়ের ঝি নামে অভিহিতা হইতেন। যন্ত্র দু'খানি বড় ঠাকুরাণী ও ছোট ঠাকুরাণী নামে অভিহিত। বড় ঠাকুরাণীর অধিকারী—চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এবং ছোট ঠাকুরাণীর অধিকারী—রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ইঁহাদের নিকট প্রাচীন কোনও রূপ দলিল পত্রাদি পাওয়া গেল না। ঐ যন্ত্র দু'খানির জন্য উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ একটা দর্শনী পাইয়া থাকেন। এই ব্রাহ্মণ পরিবার অদ্যাপি ও সততায়, তেজস্বীতায় ও মহত্ত্বে নিকটবর্ত্তী গ্রাম্য জন-সাধারণের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইয়া আসিতেছেন।

অনেকে ব্রহ্মানন্দগিরিকে রায় রাজগণের গুরু বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। 'ব্রহ্মানন্দ গিরি চাঁদরায় ও কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। পাঠক জানেন, বঙ্গের বারভূঞার মধ্যে চাঁদরায় কেদার রায় প্রধান ভূঞা। বিক্রমপুরের শ্রীপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া ইহাঁরা রাজত্ব করিতেন। ইহাঁরা পর্ত্তুগীজ ও মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, অনেকবার জয় লাভ করিয়াছেন। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চাঁদরায়ের মৃত্যু হয়, ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সহিত যুদ্ধে কেদার রায় নিহত হন। চাঁদরায়ের মৃত্যু সময়ে ব্রহ্মানন্দের বয়স ৫০।৬০ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া

ব্রহ্মানন্দ গিরি।

অনুমান করা যাইতে পারে।" * 'লঘুভারত'কার এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। লঘুভারতে লিখিত আছে,—

'কেদার গুরু সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দ গিরিস্তদা।
শিলামবায়ৎ প্রেম্না তারোমানায়িকাদ্বয় ॥
সসিদ্ধশ্চী নগরে সুরাপান বিধানতঃ।
তত্রৈব পুনরাসক্তা ডোমজাতে চ যোষিতি ॥
তচ্ছিষ্যোভৈরবানন্দোঽন্বেষয়ং স্তংবিরূপিণং।
অদর্শয় দ্বটদলে সিদ্ধ মন্ত্রং প্রযত্নতঃ ॥
ব্রহ্মানন্দো নিরীক্ষ্যৈব দিব্যজ্ঞানমবাপ্যসঃ।
তারামারাধয়ল্লভে তারোমা প্রস্তর দ্বয়ং ॥
তারোমেনায়িকেতস্য বহস্ত্যৌ প্রস্তরাসনং।
উদ্দেশ্য গমন স্থানে তদগ্রেঽগ্রেচ জগ্মতুঃ ॥
সবঙ্গে গতবান শিষ্য কেদাররায় সন্নিধৌ।
অগ্নিতপ্তাং সুরাং পীত্বাস্ব মাহাত্মাম দর্শয়ৎ ॥
কেদারস্য মনোভ্রান্তিং সুরাপ গুরু তাপিনীং।
দূরীকর্ত্তু মনাবৃক্ষং প্রস্রাবেণ দদাঽসঃ।
অগ্নিতপ্ত সুরাস্রাব প্রস্রাব বহ্নিতেজসা।
দগ্ধ বৃক্ষেণ নামাভূৎ পোড়াগাছেতিতৎপুরে ॥
পরে সান্তোল নগরে গতঃ স নিজ কাম্যয়া।
বৃক্ষোতদ্ভূতং কর্ম্ম সান্তোলধবং সবর্ণনে ॥'

ব্রহ্মানন্দ গিরির জীবন-কথা-শুধুজন-প্রবাদ লইয়া রচিত। জন-প্রবাদ ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। কিংবদন্তী এইরূপ যে ব্রহ্মানন্দের জননী অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। তাহার এরূপই

---

* সিদ্ধজীবনী—শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রণীত ২০০ শত পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কাল হইল। সে সময়ে মুসলমান রাজত্ব। শিথিল-শাসন। লোকের ঘরে অর্থ লইয়া ও সুন্দরী স্ত্রী লইয়া শান্তি নাই। ব্রহ্মানন্দের মাতার সৌন্দর্য্য খ্যাতিও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,নবাব রূপের কথায় পাগল হইলেন এবং একদিন ব্রহ্মানন্দের পিতার অনুপস্থিতিতে তাহাকে অপহরণ করিয়া আনিলেন। তখন ব্রহ্মানন্দের জননী পূর্ণ গর্ভবতী,—পথে এক তিল ক্ষেত্রে একটী পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রই ব্রহ্মানন্দ। যে তিল ক্ষেতে ব্রহ্মানন্দ প্রসূত হন, সে ক্ষেত্রের তিল গুলি কৃষকেরা অল্প কয়েক দিন যাবত কাটিয়া লওয়ায় গাছের গোড়াগুলি তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া বৃহৎ কণ্টকের ন্যায় বিদ্যমান ছিল, ব্রহ্মানন্দ প্রসূত হইবা মাত্র একটী তিল গাছের গোড়া কণ্টকের ন্যায় তাহার ললাটে বিদ্ধ হয়, নব প্রসূত সন্তানের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়াও স্নেহময়ী জননীর প্রতীকারের উপায় রহিল না, তাহাকে দস্যুগণ বল পূর্ব্বক টানিয়া লইয়া গেল। নবজাত সন্তান অসহায় ভাবে ক্ষেত্র মধ্যেই পড়িয়া রহিল।

পিতা গৃহে ফিরিয়া সব শুনিলেন, নিরুপায়, কিন্তু প্রতিবেশীগণের সাহায্যে পুত্রের সন্ধান পাইয়া তাহাকে গৃহে আনিয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে এই পুত্র যণ্ডা, গুণ্ডা হইয়া উঠিল। চরিত্র-হীন পুত্র বেশ্যালয়ে গমন ও মদ্য এবং গঞ্জিকা সেবনের একজন প্রধান পাণ্ডা হইয়া উঠিল। একদিন ব্রহ্মানন্দ এক বেশ্যালয়ে গমন করিয়াছে—বেশ্যাটী প্রৌঢ়া, সে ব্রহ্মানন্দের ললাটস্থিত ক্ষত চিহ্নটি দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সরল ভাবে ব্রহ্মানন্দ সবকথা খুলিয়া বলিলেন। ইহাতে বেশ্যার মনে ভাবান্তর হইল সে—তৎক্ষণাৎ অন্যত্র গমন করিল, পরে প্রকাশ পাইল এই বেশ্যাই ব্রহ্মানন্দের প্রসূতি। নবাব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এখন বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে। ব্রহ্মানন্দের সরল হৃদয়ে এই ঘটনায় নিদারুণ আঘাত লাগিল,—মনের খেদে সংসার ত্যাগ
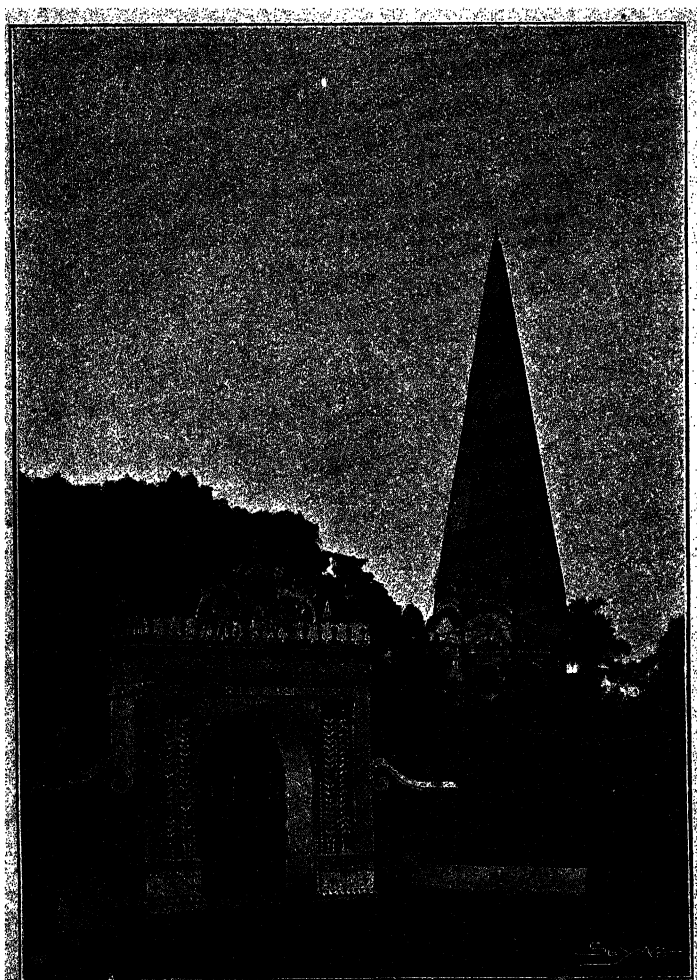
রমণার কালীবাড়ী (ঢাকা)।

করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। প্রথমে বর্ত্তমান ঢাকা সহরের উত্তর সীমানাতে রমণার ময়দানে যে কালীবাড়ী বিদ্যমান আছে তথায় আসিয়া শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসীদলের দলভুক্ত হ'ন—এবং ব্রহ্মানন্দ গিরি এই নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহাতে তাহার তৃপ্তি না হওয়ায় তান্ত্রিকমতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নাম জপ করিতে থাকেন—কিন্তু তাহাতেও সিদ্ধিলাভ হইলনা দেখিতে পাইয়া কাশীধামে গমন করেন, তথায় একদা এক যোগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়—যোগিনী মানবী নহেন ভগবতীর পার্শ্ববর্ত্তিনী ডাকিনী যোগিনী দিগের একজন—যোগিনীর অনুগ্রহে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার গুরু দত্ত মন্ত্র অশুদ্ধ আর কাশীধামে তাহার সিদ্ধি লাভ হইবে না—কামরূপ কামাখ্যায় যাইলে তাহার সিদ্ধি লাভ ঘটিবে। এই আদেশানুযায়ী ব্রহ্মানন্দ কামাখ্যায় যাইয়া নানাবিধ বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়াও তপস্যা করিতে থাকেন। নানারূপ প্রলোভন নানারূপ অত্যাচারের হাত এড়াইয়া অবশেষে ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন। ইষ্টদেবী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া সাধকের সন্দেহ ভঞ্জন করেন। ইষ্ট দর্শনে সিদ্ধ মনোরথ হইয়া সাধক বলিলেন ;—

রমণার কালী বাড়ী।

"ব্রহ্মানন্দগিরির্গিরীন্দ্রতনয়া বক্ত্রামৃতঃবাঞ্ছতি।" এইবার দেবী ভক্ত সাধককে বরদিতে চাহিলেন। ব্রহ্মানন্দ মুক্তি চাহিলেন। মুক্তি মিলিল না। দেবী অন্যবর দিতে চাহিলেন। তখন ব্রহ্মানন্দ বিরক্তির সহিত বলিলেন—'আমি তোমাকে সাধনা করিতে যাইয়া বড়ই ভুগিয়াছি সহজে ছাড়িব না, আমি যাহাতে বসিয়া তপস্যা করিতাম, তুমি সেই প্রস্তরাসন খানি বহন করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ কর।' দেবী ও তথাস্তু বলিয়া উমা-তারা এই দুই মূর্ত্তিতে প্রস্তর খানা বহন করিয়া লইতে স্বীকৃতা হইলেন। তবে কথা রহিল যে ঐ প্রার্থনার অন্যথা করিলেই—আমি তোমার আদেশ

পালন করিবনা।' ব্রহ্মানন্দ স্বীকৃত হইলেন,—দেবীও তুই মূর্ত্তিতে প্রস্তর বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। লোকে দেখিত শূন্য দিয়া প্রস্তর চলিতেছে, এক ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত কেহই দেবীকে দেখিতে পাইতনা। এইরূপ ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে ঢাকায় রমণা কালীবাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই পুণ্য—পীঠ ব্রহ্মানন্দের গুরুধাম। গুরু স্থানে প্রস্তরাসন সহ যাওয়া সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মানন্দ দেবীকে প্রস্তর নামাইয়া দ্বারদেশে বিশ্রাম করিতে বলিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে দেবী বলিলেন—'তোমার আসন এখানেই রহিল। তুমি আমাকে প্রস্তর বহন করিয়া বিচরণ করিতে বলিয়াছিলে এক্ষণে নামাইতে বলিলে কেন? অতএব আমি চলিলাম। এই কথা বলিয়া দেবী প্রস্তরখানা রাখিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এই প্রস্তরখানা অদ্যাপি রমণার কালী বাড়ীতে অবস্থিত আছে। ইহার ওজন প্রায় ১॥০ মণ হইবে।

দেবীকে হারাইয়া ব্রহ্মানন্দ উন্মত্ত প্রায় হইলেন, পুনরায় তাঁহাকে দর্শন আশায় কামাখ্যা যাত্রা করিলেন—পথে কুমিল্লা জেলার ময়নামতী পাহাড়ের নিকট এক পাটনীর কুমারী কন্যার রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন, কালক্রমে ঐ পাটনী স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। পরিশেষে শিষ্য পূর্ণানন্দের সহায়তায় ইহাঁর পুনর্ব্বার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। স্বপ্নের মত সমুদয় কথা মনে পড়ে। এইবার—শেষবার সংসার ত্যাগ করিয়া কামাখ্যা যাইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ স্থানীয় জমিদার ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সমাজপতিগণকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন তাহার সন্তানেরা ব্রাহ্মণ সমাজে গৃহীত হয়। সিদ্ধ-পুরুষ ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে সমাজপতিগণ চেষ্টা করিয়া তাহার পুত্রকন্যাগণকে ব্রাহ্মণ সমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দগিরির বংশধরেরা এখনও রমণার মঠের

সেবক, তাঁহার বংশের শেষ পুরুষ মঙ্গলগিরি অল্প কয়েক দিন যাবত কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছেন। মঙ্গলগিরির দৌহিত্র সন্তানগণ কুমিল্লা জেলার জয় মণ্ডপ পরগণাস্থ উয়াইদপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

গোঁসাই ভট্টাচার্য্য ও ব্রহ্মানন্দ গিরি এ দুইজনের মধ্যে কে প্রকৃতভাবে রায়রাজগণের ইষ্টদেবতা ছিলেন তাহার সুমীমাংসা করিবার জন্যই উভয়ের জীবন-কথা আলোচনা করিলাম। যে সকল অলৌকিক কিংবদন্তীর কথা প্রচলিত আছে সে সকল উভয়ের নামের সহিতই সংশ্লিষ্ট। পোড়াগাছা গ্রাম সম্বন্ধে 'লঘু ভারতে' যাহা লিখিত আছে তদ্রূপ গল্প গোঁসাই ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে ও প্রচলিত আছে সে সকলের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক এবং অনাবশ্যক বিবেচনা করি। ব্রহ্মানন্দ গিরি এবং গোঁসাই ভট্টাচার্য্য এ দুইজনকে অনেকে অভিন্ন ব্যক্তি বিবেচনা করিয়াই নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে গোঁসাইভট্টাচার্য্যই কেদার রায়ের গুরু ছিলেন—ব্রহ্মানন্দগিরি নহেন। ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা যায় তাহা শুধু জনশ্রুতি, সেই জনশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াই অনেকে নানারূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই ব্রহ্মানন্দকে কেদার রায়ের গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দের কীর্ত্তি-কথা ত্রিপুরাঅঞ্চলেই অধিকাংশ প্রচলিত, বিক্রমপুরে নহে। আর তাহার জন্মভূমি কোথায় ছিল-তাঁহার পিতৃ-কুল-পরিচয় ইত্যাদি পরিষ্কার রূপে কিছুই জানিতে পারি না। অপরপক্ষে কেদাররায়ের ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজা যাঁহাকে গুরুদেবের পদে বরণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে কি কোনরূপ ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদি দান করেন নাই ? যে যুগে গুরুভক্তি দেব দ্বিজে দান সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত সেই যুগের একজন রাজা স্বীয় গুরুদেবের তৃপ্তির জন্য পরলোকে অসীম পুণ্যসঞ্চয় জন্য স্বীয় গুরুদেবকে কোনরূপ ভূ-সম্পত্তি অবশ্যই

দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোনও নিদর্শন নাই। অপর পক্ষে ব্রহ্মানন্দের অধিকাংশ কীর্ত্তিই কুমিল্লা অঞ্চলে বিদ্যমান। ত্রিপুরা জেলায় যে সূত্রেই হউক তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। এসকল নানা কারণে আমরা ব্রহ্মানন্দ গিরিকে চাঁদ-কেদাররায়ের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম। আমাদের বিশ্বাস ব্রহ্মানন্দ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের এক জন সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া রায় রাজগণ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এ নিমিত্তই জন-প্রবাদ-মুখে ব্রহ্মানন্দগিরি রায় রাজগণের গুরু ছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

'গোঁসাই ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার পিতার নাম যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাতার নাম লীলাবতী। এই বেলপুকুরের ভট্টাচার্য্য বংশীয়গণ মধ্যে কয়েক ঘর বিক্রমপুরে আসিয়া বাস করেন, জপসা, রাজনগর, নড়িয়া এই তিন গ্রামে বহুকাল তাঁহাদের বংশধরগণ বাস করিয়া নদীকর্ত্তৃক গ্রাম বিনষ্টের পর অধুনা সিরঙ্গল, পালং, লোনসিং, চান্দনী ছয়গাঁ প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের বহু কুলীন ব্রাহ্মণ, ঘটক শিষ্য আছে।' *

কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মানন্দ গিরি কেদাররায়ের গুরু ছিলেন এবং গোঁসাই ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের পুরোহিত ছিলেন। ইহা প্রকৃত নহে। উত্তর বিক্রমপুরের ধলছত্রে গ্রাম নিবাসী বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ ৺ কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার কেদাররায়ের পুরোহিত ছিলেন।

কেদাররায়ের পুরোহিত বংশ।

ইনি পূর্ব্বে অশূদ্রযাজী ক্ষমতাশালী সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেদাররায়ের পৌরহিত্য নির্ব্বাচণ সম্বন্ধেও একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, রাজা একটী লৌহ মৎস্য নির্ম্মাণ করিয়া বলিলেন "যে

* ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় প্রণীত ৫৩ পৃঃ

ব্রাহ্মণ মন্ত্র প্রভাবে উহার মধ্যে জীবনী-সঞ্চার করিয়া জলমধ্যে সন্তরণ করাইতে পারিবে আমি তাঁহাকে বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য পদে নিযুক্ত করিব।'

কোন ব্রাহ্মণই এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইলনা, অবশেষে কৃষ্ণদেব বিত্যালঙ্কারের দুইপুত্র হরিদেব ও সুন্দরানন্দ চক্রবর্ত্তী রাজ সমীপে গমন পূর্ব্বক মন্ত্র প্রভাবে উহা জীবিত করিলেন কিন্তু ঐ মৎস্য জলে সন্তরণক্ষম হইল না। কেদার অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে এক কৃষ্ণদেব বিত্যালঙ্কার ব্যতীত এইরূপ শক্তিশালী ব্রাহ্মণ আর কেহই নাই, বহু সাধ্য সাধনায় কৃষ্ণদেব আসিয়া উহাতে মন্ত্র-শক্তি প্রয়োগ করা মাত্রই লৌহ মৎস্য জলে সন্তরণ করিতে লাগিল। রাজা এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে বিত্যালঙ্কার মহাশয়কে পৌরোহিত্য পদে বরণ করিলেন। এই বৈদিক-গণের পূর্ব্ব নিবাস ধূল্লা পদ্মার কুক্ষিগত হওয়ার পর হইতে ইঁহারা উত্তর বিক্রমপুরান্তঃর্গত ধলছত্র গ্রামে বাস করিতেছেন। কেদাররায় ইহাদিগকে ধূল্লা, মানগাঁও, বেড়গাঁও ইত্যাদি কয়েকখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। কেদার রায়ের মৃত্যুর পর সৈন্যগণ নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল কিন্তু সেনাপতি রঘুনন্দনরায়, মন্ত্রী রঘুনন্দনদাশ চৌধুরী, কেদার মহিষী, কালিঢালী, রামরাজা সর্দ্দার, পর্টুগীজ ফ্রান্সিস্, সেথ কালু প্রভৃতির সাহায্যে যুদ্ধে ক্ষান্ত না হইয়া দ্বিগুণ বীরদর্পে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। মানসিংহ এই সময়ে এক দূত প্রেরণ করেন যে, যদি রাজ্ঞী যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া মোগলের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি বিক্রমপুরের উপর আর কোনওরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইবেন এবং রাজ্ঞীর উপরেই সমুদয় রাজকার্য্যের ভার থাকিবে। দূতের প্রমুখাৎ এইরূপ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া মন্ত্রী ও সেনাপতি উপস্থিত অবস্থা বিবেচনা করিয়া সন্ধি করাই স্থির করিলেন এবং তদনুযায়ী রাজ্ঞীকে সমুদয় অবস্থা

বিশদরূপে জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপ সঙ্কট সময়ে যুদ্ধ চালাইলে শুধু লোক-ক্ষয় ব্যতীত অন্য কোনরূপ লভ্য নাই বিবেচনায় রাণী সেনাপতি এবং মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মানসিংহকে অচিরে তাঁহাদের সন্ধির সম্মতি জ্ঞাপন করা হইল।—মোগল সেনাপতিও আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইলেন। পরিশেষে মন্ত্রী রঘুনন্দন, 'সেনাপতি রঘুনন্দন, কালিদাস ঢালি, রামরাজা ও বিশ্বনাথ পত্রনবিশ মানসিংহের শিবিরে যাইয়া রাজ্ঞীর পক্ষে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ও মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এইরূপ বিক্রম-পুরের শেষ স্বাধীনতা চির বিলুপ্ত হইয়া গেল। যতদিন মহিষী জীবিত ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত রাজকার্য্যের ভার তাঁহার উপরই ন্যাস্ত ছিল। পরিশেষে তাঁহার মৃত্যুর পর মোগলরাজ প্রতিনিধির ইচ্ছানুসারে রায়-রাজ গণের রাজত্ব নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

মন্ত্রী রঘুনন্দন দাশ চৌধুরী বিক্রমপুরে জমিদারি। ইনি বৈদ্যবংশ-সম্ভূত,, ভরদ্বাজ গোত্রিয়। নপাড়ার চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ। সেনাপতি রঘুনন্দন ইদিলপুরের জমিদার বংশের আদিপুরুষ। সেখ কালু কার্ত্তিকপুরের জমিদারী। কালিদাস ঢালী ও রামরাজা সর্দ্দার দেওভোগ ও মুলপাড়া পৃথক দুই তালুক প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বাস করেন, এই বংশীয়গণ পরে মুখুটি ও চাটাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

সপ্তম অধ্যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে বিক্রমপুর।

ষোড়শ শতাব্দী বিপ্লবের যুগ। সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ নাম মাত্র মোগলের অধীন হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, কারণ চাঁদরায় ও কেদাররায় মোগলের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া স্বাধীনভাবেই বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। মোগলের প্রভাব সে সময়ে বিক্রমপুর অঞ্চলে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, বরং পাঠান রাজগণের শাসন-নীতি ও অন্যান্য আচার-পদ্ধতি কিয়ৎ পরিমাণে এ অঞ্চলে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শাসন-নৈপুণ্যে মোগলেরা পাঠানদের অপেক্ষা বহুল পরিমাণে উন্নত থাকিলেও তাহাদের কোনও রীতি-নীতি বা পদ্ধতির প্রভাব বিক্রমপুরবাসীর প্রতি বিস্তার লাভ করিবার প্রধান অন্তরায়—পরস্পরের ব্যবধান। অতএব তৎকালীন বিক্রমপুরের শিক্ষা-সভ্যতা, রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি, শিল্প-ভাস্কর্য্য স্থাপত্য-শাস্ত্র, সাহিত্য সমাজ-শাসন সমুদয়ের জন্যই রায়রাজ-গণ প্রশংসা বা নিন্দাভাজন ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে।

চাঁদ ও কেদার রায়ের অধিকারভুক্ত স্থান।

চাঁদরায়ের মৃত্যুর পরে কেদাররায় শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। চাঁদরায়ের মৃত্যু ১৫৮৬ খ্রীঃ অঃ হয়। ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ স্থান, সমগ্র বিক্রমপুর পরগণা, কার্ত্তিকপুর, চাঁদপুর, ইদিলপুর, সাহা-বাজপুর এবং সন্দ্বীপ রায়রাজগণের করতলগত ছিল। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ইঁহারা শাসন ও সংরক্ষণ করিতেন। হিন্দু রাজ-ধর্ম্ম-নীতি অনুসারেই ইঁহারা রাজ্য শাসন করিতেন। রাজ্যের উন্নতি-কল্পে এবং বিক্রমপুরবাসীর সুখ-সুবিধার জন্য ইঁহারা নানারূপ যত্ন করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই

সময়ে পর্ত্তুগীজ, মগ, পাঠান ও মোগল সৈন্যগণের বিবিধ নির্য্যাতনের হস্ত হইতে নিজ নিজ প্রজাগণের মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত রায়রাজগণকে বিশেষরূপে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। এজন্য ইঁহারা সর্ব্বাগ্রে স্বীয় রাজধানীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে দুর্গের শেষ-চিহ্ন কীর্ত্তিনাশা স্বীয় উদর গহ্বরে চিরদিনের জন্য গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। দুর্গ হইলেই দুর্গ রক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন—সেজন্য বিপুল সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। সৈন্যসংখ্যাও ছিল প্রচুর। তৎপর বিক্রমপুর নদী-মাতৃক দেশ ইহার দক্ষিণ দিক্ সে সময়ে প্রকৃতই বিশাল বারিধির অঙ্গীভূত ছিল। ডাক্তার ওয়াইজ তৎকালীন বিক্রমপুরের প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—"It was then all open sea to the south of Bikrampur." † নদ নদী-সঙ্কুল দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নৌ বলের বিশেষ প্রয়োজন, এজন্য রায়রাজগণ বহু নৌ সৈন্য, রণতরী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে নৌ-বল ও সৈন্য-বল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। উপকূলবর্ত্তী রাজ্যের নৌ-বলের একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বাণিজ্যব্যাপদেশে আগত নৌ-সমর কুশল পর্ত্তুগীজগণের সহিত বিবিধরূপে সদ্ভাব সংস্থাপন করিয়া রায়রাজগণ নিজ নিজ নৌ-সৈন্য, রণতরী এবং পদাতিক সৈনিকগণকে দেশীয় ও বিদেশীয় উভয়রূপে শিক্ষাদান করিয়া মোগলের গতিরোধে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শাসন-নীতি।

যে দেশে যে জিনিষের প্রয়োজন সেই দেশবাসী নর-নারী সে সমুদয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে বা গঠনেও বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। বিক্রমপুর নদী মাতৃক দেশ বলিয়া এস্থানের নৌ-শিল্পীগণও তরণী-গঠনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিত। শ্রী-পুর-নৌ-শিল্পের কেন্দ্রভূমি ছিল।

† J. R. A. S. B—P. 205, 1874.

এই স্থলে নানাজাতীয় তরণী-শ্রেণী-নির্ম্মিত হইত। কার্ভালোর রণ-তরী সমূহ মগ-দিগের সহিত যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইলে সে সকলের পুনর্গঠনের জন্য তাহাকে শ্রীপুর আসিতে হইয়াছিল। তৎকালে শ্রীপুরে কোষা, জল্‌বা, ঘ্রাব, পারেন্দা, বজ্‌রা, পাতেলা, সলব, জেলে, পালেন, বহর, বালাম, খাটকুড়ি, মহালকুড়ি, পালওয়ার, জঙ্গিখালু, ভাওয়ালী, ছান্দী, ছিপ, ডিঙ্গী, পান্সী, কুমারিয়া, ঘাসী, সরঙ্গা কোন্দা, ঢুটা, ভেদী জঙ্গ ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণীর তরী প্রস্তুত হইত। কোষা, ছিপ্ জেলে ইত্যাদি যুদ্ধার্থে ব্যবহৃত হইত। কোষা ইত্যাদি আবার আগ্নেয়াস্ত্রে ও সুশোভিত হইত। নৌ পরিচালনে পূর্ব্ববঙ্গের মাঝিগণ বিশেষ দক্ষ ছিল। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে কবি কঙ্কণ, কেতকদাস, ক্ষে-মানন্দ প্রভৃতি কবিগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে বাঙ্গাল মাঝিগণের প্রতি কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। সমুদ্র গমনে ও পূর্ব্ববঙ্গের অর্থাৎ বিক্রমপুরবাসী মাঝিগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিত। সেকালে ডিঙ্গা সাজাইয়া বাণিজ্য-ব্যাপদেশে বিভিন্ন দেশে গমন বিষয়ে নানা উপাখ্যান, নানা গ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনপতি সওদাগর সিংহল যাত্রার সময় সঙ্গে যে সমুদয় নাবিক লইয়াছিলেন তাহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিল। তাই মগড়ার ভীষণ ঝড়ে ডিঙ্গা নাশে নাবিকদের রোদনে দেখিতে পাই ;—

'কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাত।
হল্‌দীগুড়া হারাইল শুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো।
বিদেশে রহিলুঁ না দেখিলুঁ মাও পো॥
আর বাঙ্গাল বলে আমি অই তাপে মৈল।
কালী গুরী দুটী কাগু সেই কোথা গেল ইত্যাদি।'

শ্রীপুরে সেকালে নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মিত হইত, এমন কি কামান পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইত। চন্দ্রদ্বীপ রাজবাটীতে একটি পিত্তল নির্ম্মিত কামান বিদ্যমান আছে। ঐ কামানের গায়ে রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম ও '৩১৮' এইরূপ এবং নির্ম্মিতা রুপিয়া খাঁ—সাং শ্রীপুর এই কথা গুলি লিখিত আছে। এই কামানটির দৈর্ঘ্য ৭¾ ফিট, বেড় ২।৹ ফিট, মধ্য-ভাগের ব্যাস ১৯॥ ইঞ্চি। * ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীপুর নগরীতে যে নানা শ্রেণীর শিল্পীগণের সমাবেশ ছিল ইহা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়। কেদার রায়ের তণতরী সমূহ শ্রীপুরে নির্ম্মিত আগ্নেয়াস্ত্র সমূহেই সুসজ্জিত হইত। একদিকে যেমন শিল্পীর বাস হেতু শ্রীপুর সর্ব্বপ্রকার শিল্প কলায় সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তদ্রূপ বিবিধ স্থাপত্য-শিল্পে ও বিক্রমপুর তৎকালে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। শ্রীপুরের কোটি-শ্বর ও অন্যান্য বিবিধ হর্ম্ম্যরাজী এবং রাজাবাড়ীর মঠ অদ্যাপি তৎকালীন স্থাপত্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মঠ বাঙ্গালা দেশের আর কোথায়ও বিদ্যমান নাই। ভাস্কর্য্য-শিল্পের অবনতি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হয়। এ যুগে তাহার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্ত্র-শিল্পের জন্য ও শ্রীপুর বিশেষ বিখ্যাত ছিল।

স্থাপিত্য-শিল্প।

* The only memorial of this Bhu'yas is a brass gun, still preserved at Chandradip with his name and that of the mark Rupiya Khan of Sripur engraved on the breech. This gun is $7\frac{3}{4}$ feet in length; $2\frac{1}{2}$ feet in girth at the breech; and $19\frac{1}{2}$ inches at the muzzle. Through the trunnious, rings had been inserted by which the gun was fastened to the carriage. J. R. A. S. B. 207 P. 1874. নারায়ণগঞ্জের অন্তঃর্গত সোণারগাঁয়ের মনোহরবাগ নামক স্থানে ঈশার্থাঁর নামাঙ্কিত কামান সমূহ হইতেও তৎকালে যে পূর্ব্বাঞ্চলে কামান ইত্যাদি প্রস্তুত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ্ বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেন, তিনি শ্রীপুরের বস্ত্রশিল্পের বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "Great store of Cotton cloth is made here" ষোড়শ শতাব্দীতে যে বিক্রমপুর সর্ব্বদিক্ দিয়াই কমলার ভাণ্ডার রূপে পরিগণিত হইত তাহা উক্ত শতাব্দীর প্রথমভাগে বঙ্গদেশ ভ্রমণকারী ইতালী দেশবাসী লুডিভিকো ভিভার থেমার ভ্রমণ-কাহিনী হইতেও বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। এদেশে যেমন শস্য, চিনি, তূলা, আদা ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য ও পশু-পক্ষীর সংখ্যাপ্রচুর এরূপ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। *

বস্ত্র-শিল্প।

যুদ্ধার্থে সে সময়ে তীর-ধনু, বন্দুক, কামান, লাঠি সড়্‌কি ঢাল তরোয়াল, শূল (শূল্পী) ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত। বিক্রমপুরের তীরন্দাজ ও লাঠিয়ালগণ বিশেষ খ্যাতিমান ছিল।

অস্ত্র, শস্ত্র ইত্যাদি।

ধর্ম্ম বিষয়ে এযুগে বিবিধ আন্দোলন উপস্থিত হয়—চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম, এ সময়ে কাষ্ঠ কাটা বা বর্ত্তমান কাঠাদিয়া গ্রামনিবাসী জগন্নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ বিক্রমপুরাঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। হিন্দু সম্প্রদায় সাধারণতঃ বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীস্থ জন-সাধারণই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বন করিত। রায় রাজগণ তান্ত্রিক গুরুর শিষ্য ছিলেন। এই সময়ে তন্ত্র মত অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। গোঁসাই ভট্টাচার্য্য, ব্রহ্মানন্দগিরি, সর্ব্বানন্দ ইত্যাদি তান্ত্রিক সিদ্ধ মহা

ধর্ম্ম-সংস্কার, সমাজ পূজা-পার্ব্বণ-ব্রত নিয়ম ইত্যাদি।

* The Travels of Ludivico di Varthema.

পুরুষগণের কীর্ত্তি প্রভাবে অধিকাংশ নর-নারীই তান্ত্রিক মতে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দের 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী' ও সর্ব্বানন্দের, সর্ব্ববিদ্যা-তরঙ্গিনী এই যুগে বিরচিত হয়। তন্ত্রের বিবিধ সদাসৎ অনুষ্ঠান ও এ সময়ে এ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। নরবলি, পঞ্চমকার সাধন খুবই ছিল। এখনও বিক্রমপুর অঞ্চলে তন্ত্রের যত বিভিন্ন গ্রন্থরাজি দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্গের আর কোথাও তাদৃশ আছে কিনা বিশেষ সন্দেহ স্থল। বিশেষ রায় রাজগণ তান্ত্রিক গুরুর শিষ্য ছিলেন বলিয়া রাজানুগ্রহ লাভ আশেও অনেকে উক্ত মতানুসারে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। রাজ্য শাসন-সংরক্ষণে ইঁহারা প্রচীন হিন্দু রীত্যানুসারে শাসন সংরক্ষণ করিতেন। ব্রাহ্মণের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা প্রায়শঃই ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদি পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। রাজপথ নির্ম্মাণ, জলাশয় উৎসর্গ, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানই সেকালের পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। গুরুতর অপরাধীগণের প্রতি শূলে আরোপিত করিয়া কিংবা জল্লাদ দ্বারা গর্দ্দান লইবার ব্যবস্থা ছিল। চৌর্য্য ইত্যাদি তখন খুব অল্পই অনুষ্ঠিত হইত, কারণ সকলের ঘরেই খাবার থাকিত। প্রচুর শস্য জন্মিত, মৎস্য, দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, লবণ ইত্যাদি এত সুলভ ছিল যে সেকালের নর-নারী অতি সামান্য মাত্র আয়ে বারমাসের তের পার্ব্বণ নির্ব্বাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। বিক্রয়ের জন্য অধিকাংশস্থলেই কড়ি ব্যবহৃত হইত। রায় রাজগণ কোনরূপ মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে বিশেষ কোন বিবরণ জানিতে পারি নাই, আর করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের প্রচলিত কোন মুদ্রা হস্তগত করিতে পারি নাই।

সামাজিক দলাদলি খুবই ছিল। সামান্য কারণেই জাতঃপাত করিতে একালের ন্যায় সেকালের ব্রাহ্মণগণও বিশেষ পটু ছিলেন। বরপণের

পরিবর্ত্তে কন্যাপণ সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহও হইত। সমাজে নানাজাতীয় লোকের বাস ছিল। স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কামার, (লৌহ কর্ম্মকার) সাহা, তিলি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায় দ্বারা সবিশেষ উন্নতি লাভ করিত। একদিকে যেমন দেশে প্রচুর শস্য জন্মিত এবং সমুদয় জিনিষপত্রই সুলভ ছিল, তেমনি আবার একবার শস্য ভালরূপ না হইলেই দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত, কারণ আম্‌দানী বা রপ্তানী হইবার সুযোগ ছিল না। এইজন্যই মনুষ্য বিক্রীর প্রাচীন দলিল ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সমৃদ্ধ গৃহস্থেরই নফর বা সিক্‌দার থাকিত। দান-ধ্যান না করিত এমন গৃহস্থ কেহই ছিলনা—মুষ্টি ভিক্ষাদান, অতিথি সেবা, জলদান, ফলদান ইত্যাদি সাধারণ রীতি ছিল।

দস্যু-ডাকাতের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও জনসাধারণ তাদৃশ ভীত হইতনা, কারণ তাহার প্রতীকারের উপায়ও প্রতি গৃহেই থাকিত। সেকালে সকলেই কুস্তী, লাঠি খেলা, বন্দুক চালান, সন্তরণ, ও বন্দুকের ব্যবহার জানিত কাজেই দস্যুদল অতর্কিতভাবে গৃহস্থের বাড়ী আক্রমণ করিলেও গৃহস্থগণ ভীত হইত না প্রতীকার করিতে পারিত। দস্যুগণ একেবারে কপর্দ্দক বিহীন করিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইত না।

পূজা-পার্ব্বণ এবং আমোদ-প্রমোদও খুব ছিল। কবির গান, যাত্রা, পাঁচালী, মনসার ভাসান গান, হরিসংকীর্ত্তণ, চড়কপূজা, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, হোরীর গান, ভাসান-যাত্রা, ত্রিনাথের গান ইত্যাদি আমোদ ও উৎসব বিশেষরূপে দেশবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিত। মহিলা বারব্রতগুলি বর্ত্তমানেও যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও তেমনি ছিল। সেকালে চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপন করিয়া বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ এ উভয় স্থান হইতেই উপাধি প্রাপ্ত হইত। ন্যায়লঙ্কার, তর্কালঙ্কার,

বিস্তাভূষণ, তর্কভূষণ, ন্যায়চঞ্চু ইত্যাদি উপাধির বিশেষ সমাদর ছিল। অল্প অল্প পার্সীরও প্রচলন ছিল। রাজকার্য্য ও বাঙ্গালা ভাষাতেই সুসম্পন্ন হইত।

সবদিক্ দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে সে যুগের বাঙ্গালী স্বাস্থ্য-সুখে ও মনের শান্তিতে কালাতিপাত করিত। সে যুগের রাজনৈতিক গোলযোগে সমস্ত ভারত সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে যুগে একজন বঙ্গবীর বঙ্গসৈন্যের সাহায্যে অসীম সাহস সহকারে মোগল-পাঠান-মগ ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া অবলীলা ক্রমে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সে যুগের সামাজিকও সাধারণ ইতিহাস পাঠকবর্গের জ্ঞাত থাকা সমীচিন বোধেই আমরা এ অধ্যায়ে তাহার অবতারণা করিয়াছি।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট—আলোচনা ১

অষ্টম অধ্যায়।

আলোচনা।

উপক্রমণিকা—১—১০ পৃষ্ঠা।

উপক্রমণিকায় বারভূঁইয়ার ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। আমরা শুধু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লইয়াই আলোচনা করিয়াছি এক্ষণে এতৎসম্পর্কিত বিবিধ কিংবদন্তী সমূহেরও আলোচনা করিলাম। 'বাঙ্গালার সামাজিক

বারভূঁইয়া।

ইতিহাস, প্রণেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় বলেন—"পাঠান রাজত্বকালে নবাবের রাজধানী হইতে দুরবর্ত্তী স্থানের ভূঁইয়ারা নবাবকে কিছু কিছু রাজস্ব দিয়া অধীনতা স্বীকার করিত। তদ্ভিন্ন তাহারা নিজ নিজ চত্বরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে থাকিত এবং পার্শ্ববর্ত্তী ভূঁইয়াদের সহ স্বেচ্ছামত সন্ধি-বিগ্রহ করিতে পারিত। তজ্জন্য ভূঁইয়াদের সচরাচরই ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিত। যে ভূঁইয়া যখন পরাক্রান্ত হইত তখন সে পার্শ্ববর্ত্তী অপর ভূঁইয়াদিগকে নিজের অধীন করিয়া অথবা বেদখল করিয়া নিজ সম্পত্তি এবং পরাক্রম বৃদ্ধি করিত। এই উপায়ে যখন যে বারজন ভূঁইয়া সর্ব্বপ্রধান হইতেন তাঁহারাই বাঙ্গালাদেশের বারভূঁইয়া নামে খ্যাত হইতেন। একবৎসর যে বারজন প্রধান হইত পরবৎসর হয় ত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খর্ব্বীকৃত হইতেন, অন্যান্য দুই চারিজন উন্নতি লাভ করিয়া বারভূঁইয়া মধ্যে গণ্য হইত। সেই সকল প্রধান ভূঁইয়ার সংখ্যা কখন বা কম হইয়া নয়জন মাত্র থাকিত, কখন বা বৃদ্ধি হইয়া ষোলজন পর্য্যন্ত হইত। শাহ সমুসুদ্দীনের সময়ে চারিজন হিন্দু ও আটজন মুসলমান ভূঁইয়া সর্ব্বপ্রধান ছিল। রাজা কংশরামের শাসন সময়ে নয়জন হিন্দু এবং দুইজন মুসলমান

প্রধান ভূঁইয়া ছিল।” দুর্গাচরণবাবুর এ মতটি আমরা সমীচিন বলিয়া মনে করি। আমাদের বিশ্বাস এইরূপ সংখ্যা পরিবর্ত্তনের নিমিত্তই নিকোলাস পিমেণ্টা প্রভৃতির বর্ণনায় দেখিতে পাই যে সম্রাট আকবর সাহার রাজত্বকালে বাঙ্গালায় বারভূঁইয়াগণের মধ্যে নয়জন মুসলমান এবং তিনজন হিন্দু ছিলেন।

‘বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত প্রবাদে যে বারভূঁইয়া’ শব্দটি কথিত হয়, তাহা বোধ হয় ‘বড় ভূঁইয়া’ শব্দের অপভ্রংশ। কেননা পূর্ব্বে জমিদার মাত্র সকলকেই ভূঁইয়া বলা হইত। সুতরাং শত সহস্র ভূঁইয়া ছিল। আর প্রধান প্রধান ভূঁইয়া যাঁহারা প্রায় স্বাধীন নরপতির তুল্য ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা সর্ব্বদা সমান থাকিত না। সময়ে সময়ে নয়জন হইতে ষোলজন পর্য্যন্ত হইত। সুতরাং তাহাদিগকে ‘বারভূঁইয়া না বলিয়া বড় ভূঁইয়া বলিলেই ঠিক্ অর্থ হয়। ‘বিশ্বকোষ’ অভিধানে এ বিষয়ে আর একটী প্রমাণ আছে—

“কামতাপুরে দুর্ল্লভ নারায়ণ রাজার সময়ে ঐ রাজ্যে বিস্তর বিশৃঙ্খলা ও অশাসন হয়। রাজার বন্ধু গৌড়েশ্বর কামতাপুর রাজ্য সুশাসন সংস্থাপন জন্য সাতটি সুযোগ্য ব্রাহ্মণ এবং সাতটি সুযোগ্য কায়স্থ কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন। সেই চৌদ্দজন বিজ্ঞলোক ঐ রাজ্যে সুশাসন ও শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদের যোগ্যতা দৃষ্টে তাঁহাদিগকে প্রচুর ভূমি সম্পত্তি দিয়া নিজ রাজ্য মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে ‘বারভূঁইয়া’ উপাধি দিয়াছিলেন।”

‘এখন দ্রষ্টব্য এই যে চৌদ্দজন ‘ভূঁইয়ার বারভূঁইয়া’ উপাধির কোন অর্থ হইতে পারে না। অথচ ‘বড় ভূঁইয়া’ বলিলে সদর্থ হয়। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে ‘বারভূঁইয়া’ কথাটি প্রকৃত পক্ষে ‘বড় ভূঁইয়া’ কথার অপভ্রংশ মাত্র।’

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস—শ্রীদুর্গাচরণ সান্যাল প্রণীত ৪৩৩—৪ পৃষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায়।

১১—পৃষ্ঠা হইতে ২৮—পৃষ্ঠা।

(বংশপরিচয় ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা)

ইদিলপুরের ঘটকবংশীয়গণের নিকট বহু প্রাচীন কায়স্থ পরিবারের বংশাবলী আছে জানিতে পারিয়া উক্ত বংশোদ্ভব ইতিহাসানুরাগী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট কেদার রায়ের বংশাবলী জানিতে চাহিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলাম এবং তদুত্তরে উক্ত রায় মহাশয় আমাকে যাহা লিখিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

সবিনয় নিবেদন এই—আপনার পত্র পাওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই আমি চাঁদরায় কেদার রায় সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করা যায় কিনা এবং তাহার বংশাবলী কোথায় কি ভাবে পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু বহু অনুসন্ধান দ্বারাও তাহাদের সঠিক বিবরণ পাওয়া যাইতেছেনা। অনেকে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বংশাবলীর পরিচয় দেন বটে কিন্তু তাহাদের পরিচয় নিঃসন্দেহে গ্রহণ না করার অনেক কারণ বর্ত্তমান আছে। ভিন্ন ভিন্ন ৬।৭ স্থানের ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন কিন্তু সুধু তাহাদের বলা (statement) ছাড়া আর কোনও প্রমাণ পাই নাই। আমি ইদিলপুরের চৌধুরী বংশসম্ভূত। আমাদের মূল পুরুষ ৺কমলশরণ রায় চৌধুরী, চাঁদরায়ের মাসতুত

ভাই ছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে, এরূপ প্রবাদ কেন অনেক বিষয় মধ্যে নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা হইতেও চাঁদরায়ের বংশাবলীর কিছুই পাওয়া যায় না। **ঘটকের গ্রন্থাদিতেও উহাদের বংশ বিবরণ পাওয়া যাইবেনা ও নাই।** কারণ আমাদের ঘোষ, বসু প্রভৃতি কুলীনগণ কৌলীন্যচ্যুত হইলে ঘটকগণ তাহাদের বংশ লিখেন না। * * * চাঁদরায় প্রভৃতি দেববংশীয় ছিলেন বলিয়া তাহাদের বংশ বিবরণ ঘটকগণ পূর্ব্বাবধি লিখিতেন না এবং এ সমুদয় কারণেই মূল্যবান উক্ত রায় পরিবারের সম্পূর্ণ বংশাবলী বা কিয়দংশ ও এখন পাওয়া দুষ্কর।”

বিনীত—

শ্রীবিশ্বেশ্বর রায়।

(মুন্সীগঞ্জ—ঢাকা)

বিশ্বেশ্বর বাবুর এইরূপ পত্র পাইয়া আমি নিরাশ না হইয়া যাহারা যাহারা চাঁদরায় কেদার রায়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন তাহাদের নিকট হইতে স্বীয় স্বীয় বংশাবলী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম এবং তাহাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলাম তাহার ফলে সে সকল কেদার রায়ের মন গড়া বংশধরগণ নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। উত্তর বিক্রমপুরে একমাত্র মূলচর নিবাসী দুর্গাচরণ রায়, মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তঃর্গত গঙ্গাধরদি গ্রামের শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রায় ও মাদারীপুর মহকুমার অন্তঃর্গত কুতবপুরের শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমায় রায় মহাশয় যে কেদার রায়ের বংশধর তৎসম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে এ প্রতীতির কারণ সমুহ এখানে উল্লেখ করা গেল। মাণিকগঞ্জ মহকুমার অংন্তর্ভুক্ত থানা হরিরামপুরের এলাকাধীন নটাখোলা গ্রাম

নিবাসী শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর বসু মজুমদার মহাশয় তারিণী চরণ রায় মহাশয়ের ও প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের সম্পর্কে অনেক কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। শ্রীপুর পদ্মার কুক্ষিগত হইলে ইঁহারা রায়পুর গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। অবশেষে রায়পুর ও ভাঙ্গিয়া গেলে ইহারা চাঁদরায় নামক তালুকের অন্তঃর্ভুক্ত গঙ্গাধরদি গ্রামে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। এখনও ভাটের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়,—

'কেদারের বংশে জন্ম প্রাণকৃষ্ণ রাজা।
প্রাণ ভয়ে লইলা গিয়া রায়পুরাতে বাসা॥
গেল রাজ্য গেল ধন বশ না মানিল।
যুবকের দাব তাহে কিছুনা কমিল॥
নইড়া হইতে রাজ বহু আনাইয়া।
বানাইলা হর্ম্ম্য এক দেওয়াল ঘিরিয়া॥
বড় বড় রাস্তা ঘাটে শোভা বাড়াইলা।
চৌদিঘীর পাড়ে এক হাট বসাইলা॥
এত করে শান্তি তার ভাগ্যে না মিলিল।
ঢালির বেটা যুক্তি করে প্রাণ নিতে এল॥
ভাগ্যে ছিল ভীমার নাতি মস্ত বেটা বটে।
কোষা ছিপা যা পাইল তাই লয়ে ছোটে॥
তার চোট সইতে কিন্তু নাহিক পারিয়া।
গেল ঢালি পালাইয়া প্রাণ হাতে লইয়া॥
সকলে রামার গান আনন্দে গাহিলা।
প্রাণকৃষ্ণ তার সহ সখ্যতা করিলা॥
একশ টাকা পুরস্কার তখুনি পাইলা।
পাঁচ টাকা আর তার বেতন করিলা॥

চারিদিকে পড়ে গেল রামার সুনাম।
নৃত্য গীত করে সবে নাহিক বিরাম॥

অকালেতে কাল এসে তাহারে লইল।
এর কাছে ভূঁয়াগিরি কিছুনা খাটিল॥
রামকৃষ্ণ পুত্র রাখি চক্ষু যে মুদিল।
ভূমে পড়ি গঙ্গামণি কাঁদিতে লাগিল॥

এই ভাটের ছড়াটি অসম্পূর্ণভাবে পাওয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণভাবে পাওয়া গেলে হয়ত অনেক কথাই পরিষ্কাররূপে পাওয়া যাইত। প্রাণ কৃষ্ণের জীবিতকালেই রায়পুর পদ্মার উদরসাৎ হয়। ইহাদের চাঁদরায় নামক তালুকের নম্বর ৪,৪৪৪নং উহা সেরপুর, নওয়াকান্দী ও বুধারকান্দী, বালিয়াকান্দী, ছিলামপুর, গঙ্গাধরদি, পাঠানকান্দী, হেমরাজপুর, নিজামডাঙ্গি ও কাঞ্চনপুরের কতকাংশ এবং আরও কতকগুলি গ্রাম সম্বলিত। এ সকলগুলি এক্ষণে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তঃর্ভুক্ত। সেরপুরের মধ্যে প্রাচীন 'চাঁদরায়ের চক' ও রায়ের হাট এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু শীঘ্রই যে ইহা পদ্মার কুক্ষিগত হইবে তাহা অতি নিশ্চিত। ইহাদের নিকট পারস্যভাষায় লিখিত একখানা সনদ ছিল, ঐ সনদের বলে ইহারা প্রায় দুইশত বিঘা পরিমাণ নিষ্কর জমি ভোগ করিতেন। ১৩০২ সনের বৈশাখ মাসের ভীষণ ঝড়ে তারিণীচরণ রায় মহাশয়ের সমুদয় ঘর ভূমিসাৎ হয় তাহার ফলে ইহাদের সমুদয় কাগজপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারা যায়,—

(১) চাঁদরায় কেদাররায় দুই ভাই ছিলেন। পিতাপুত্র নহে।

(২) চাঁদরায় গুরুগোঁসাই ভট্টাচার্য্যের শাপে নির্ব্বংশ হন। রায় রাজগণের ইষ্টদেব বা বংশগুরু গোঁসাই ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মাণ্ড গিরি নহেন।

(৩) ঈশাখাঁ কর্ত্তৃক সোণামণি অপহরণের বিষয় যে প্রকৃত তাহা ইহারা স্বীকার করেন। ইহাদের নিকট 'মেহের আফজুন' নামক হস্ত লিখিত একখানা পারস্যগ্রন্থ আছে—তাহাতে সোণামণি ও ঈশাখাঁর বিষয় লিখিত আছে। গ্রন্থখানা ইহারা হস্তচ্যুত করিতে স্বীকৃত নহেন।

(৪) ইহারা ভূঁইয়া উপাধিধারী 'দে' রায়। ঘৃতকৌশিক গোত্র এবং শাক্ত। এখনও ইহাদের বাড়ীতে পূজায় বলি হয়। ইহারা অদ্যাপি জন সাধারণ কর্ত্তৃক রাজা সম্বোধনে সম্বোধিত হইয়া থাকেন। হারাণ রাজা ১০৩ বৎসর বয়সে অল্প কয়েক বৎসর হইল প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চাঁদরায় কেদাররায় সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াইজ ১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—বাহুল্যভয়ে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইলনা। ইহাদ্বারা অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের কৌতূহল তৃপ্ত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ওয়াইজ সাহেবের এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে চাঁদরায় কেদার রায়ের সম্পর্কে বাঙ্গালা সাহিত্যে তেমন আন্দোলন ও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানিনা, ইহা যে একান্ত পরিতাপের বিষয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

Chand Rai and kedar Rai of Bikrampur.

The large and important pargana of Bikrampur, then on the west of the Ganges, which contains the residence of Ballal Sen and the settlements of the several of the Rar'hi Kulin Brahmins was governed by **two brothers Chand Rai and Kedar Rai.** They were Kayasthas, and their 'Padabi' orfamily title was De'.

The tradition is, that about a hundred and fifty years before the reign of Akbar, Nim Ra'i came from Karnat and settled at Ar'a Phulbaria' in Bikrampur. He is belived to have been the first Bhuya, and to have obtained the sanction of the ruling monarch to his retaining the title as an hereditary one in the family. Nothing is known of the other descendants of Nim Rai, but at the time we are now writing of the two brothers, whose names are always mentioned together were Bhuya's of this extensive Parganah.

Between Isa'khan of Khizirpur, whose stronghold was on the opposite bank of the Ganges, and the two brothers there, was constant warfare. Isakhan made a successful raid into his enemies country, carried off and forcibly married sonai (Swarnama'ye) This is the only daughter of Chand Rai. Story that remains in connection with the two brothers. Several memorials however of these Bhuyas still exist.

* * * * * *

On the south of the river Padma, at Ar'aphu'lburia', these Bhyuas resided, where there is a piece of land still called Kedar-bari, and a large tank constructed by the two brothers.

After the death of Chand Ra'i and Kedar Rai nothing is known of the family. The elder branch it is said, became extinct, but the descendents of a younger son still survive, and **reside at Muilchar, south of Munshigunj.**

From this family the Purgana of Bikrampur, passed into the hand of Bhu'yas. They were Samajpati of their caste, and held the most prominent position among

land-holders of Bikrampur. Tradition states that they had 700 slaves attached to their establishment and that they gave away a great portion of the Purgannah in small Taluqes to Brahmin and others. Several of these grants are still recognised as independent Taluks by the famous English Government. Towards the end of the last century Raja Rajbullabha the famous Dewan of Dhaka took from them the Samajpati rank which they now so long held, and assumed it himself. The river Padma shortly afterwards washes away their princely residence, and they too, like the Bhuyas, disappear from history.

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ও চাঁদরায় কেদাররায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—কিন্তু তাহার কোন কথাই তেমন প্রমাণ প্রয়োগের সহিত আলোচিত হয় নাই বলিয়া উল্লেখ করা গেল না। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় 'ভক্তমালে'র চাঁদরায়ের সহিত বিক্রমপুরের চাঁদরায়কে অভিন্ন ব্যক্তিরূপে প্রমাণিত করিতে যাইয়া যেরূপ ঐতিহাসিক ভেল চালাইয়াছেন তাহা বস্তুতই বিপজ্জনক, বাঙ্গালার ইতিহাসে এইরূপ ভেল চলিলে আর রক্ষা নাই। 'ভক্তমালে' স্পষ্ট লিখিত আছে—

'রাজমহলেতে স্থিতি চাঁদরায় নাম।'

কৈলাসবাবু নিজ বাহাদুরী টুকু বজায় রাখিবার জন্য পূর্ব্বাংশ টুকুবাদ দিয়া শুধু লিখিয়াছেন—চাঁদরায় নাম। ইত্যাদি। এইরূপভাবে সত্য গোপন করিতে যাওয়া সাহিত্যের সর্ব্বনাশের কারণ! কৈলাসবাবুর ন্যায় প্রবীণ ঐতিহাসিকের এইরূপ ঐতিহাসিক গবেষণায় আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২৯ পৃষ্ঠা হইতে—৩৬ পৃষ্ঠা।

সোণাবিবির প্রকৃত নাম স্বর্ণময়ী, ডাকনাম সোণামণি। সোণামণি চাঁদরায়ের অত্যন্ত আদরের পাত্রী ছিলেন। বাখরগঞ্জের কোনও খ্যাতিমান জমিদারবংশে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পকাল পরেই বালিকা বয়সে সোণামণির পতি-বিয়োগ হয়। পতি বিয়োগের পর চাঁদরায় স্নেহময়ী কন্যাকে নিজ আলয়ে আনয়ন করিয়া যত্নের সহিত লালন-পালন করিতে থাকেন। সোণামণির সৌন্দর্য্য-খ্যাতি সেকালে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

দেশীয় জন-প্রবাদ এই যে ঈশাখাঁ একবার চাঁদরায় কেদাররায়ের রাজধানী শ্রীপুরে যাইয়া দৈবক্রমে চাঁদরায়ের কন্যা সোণামণিকে দেখিতে পাইয়া তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'ন এবং স্বীয় রাজ্যে গমনানন্তর সোণামণিকে লাভ করিবার আশায় রায় রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করেন। তাহারি ফলে উভয় রাজ্য মধ্যে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। "এই সময়ে শ্রীমন্তখাঁ, চাঁদরায়ের সহিত খিজিরপুরে অবস্থান করিতেছিল। রায় রাজগণের জয় অপেক্ষা পরাজয়ই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সেই মনোগতভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং সমধিক বন্ধুতার ভান করিয়া চলিতে লাগিল। কোন সুযোগে এই অমাত্য ঈশাখাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, খাঁসাহেব তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাহাদের পরস্পর কথাবার্ত্তার পর ঠিক্ হয় যে, যে কোন উপায়েই হউক, শ্রীমন্ত সোণামণিকে আনিয়া ঈশাখাঁর অঙ্ক-শায়িনী করিয়া দিবে। তৎপরিবর্ত্তে খাঁসাহেব তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিবেন।"

"চাঁদ ও কেদাররায়ের অজ্ঞাতসারে, শ্রীমন্ত শ্রীপুর আসিয়া প্রকাশ করিল যে, রায় ভ্রাতৃদ্বয় শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াছেন। ঈশাখাঁ অচিরে সসৈন্যে শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া সোণামণিকে আত্মসাৎ করিবে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। কিরূপে রাজধানীও সোণামণিকে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। শ্রীমন্ত রাজপরিজনকে পলায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী, তাহার কোন কথায়ই স্বীকৃত না হইয়া রাজধানী রক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাণী রাজ্য রক্ষার জন্য যতদূর ব্যস্ত না হউন, কন্যা সোণামণির রক্ষার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর উতলা হইয়া পড়িলেন। পরে শ্রীমন্তের প্ররোচনায় এই স্থির হইল যে, সোণামণিকে তাহার শ্বশুরালয়ে চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া আসিলে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। রঘুনন্দন ইহার প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু রাণীকে কোনমতেই স্বমতে আনিতে পারিলেন না। নৌকাযোগে রাজকন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠান স্থিরীকৃত হইলে, ধূর্ত্ত শ্রীমন্তই তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া চলিল। এদিকে নাবিকদের সহিত পূর্ব্বেই শ্রীমন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তদনুসারে তাহারা চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্ত্তে নৌকা সোণারগাঁর অভিমুখে চালাইয়া দিল। বলা বাহুল্য সোণামণির সহিত শ্রীমন্তখাঁ অচিরে সোণারগাঁ পঁহুছিয়া চাঁদরায়ের সেই অসামান্যা রূপবতী তনয়াকে ঈশাখাঁর হস্তে সমর্পণ করিল।"

'চাঁদরায় রাজধানীতে পোঁছিয়া, অমাত্য বন্ধু ও বান্ধব কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিলেন না। কেবল অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া কোটিশ্বরের মন্দির মধ্যে পতিত হইয়া রহিলেন। প্রবাদ আছে, এই অবস্থায় দুই দিবস অতিবাহিত হইলে পর তদীয় ইষ্টদেবী তাঁহাকে স্বপ্না-

বস্থায় দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস! যাহা হইবার হইয়াছে, এখন এই অকারণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়স্কর। তুমি ভবিষ্যত বিপদ্ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হও। * * * এই সকল ঘটনার পর কন্যারত্ন হারাইয়া ও রাজ্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া চাঁদরায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। * * * দুষ্ট, ধূর্ত্ত বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্তখাঁ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া খিজিরপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরে কিন্তু তাহার বংশধরেরা পুনরায় বিক্রমপুর ও সাহবাজপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে থাকেন.'

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত
(বারভূঞা ৭৮—৮১)

তৃতীয় অধ্যায়।

সন দ্বীপের যুদ্ধ।

৩৭ পৃষ্ঠা হইতে—৪৯ পৃষ্ঠা।

এই অধ্যায়ের লিখিত বিবরণী ডুজারিক প্রণীত Historicade Rebus in India Orientales (V· V. Patric) সাহায্যে লিখিত। আমরা এখানে উহার মূল, তাহার ইংরেজী অনুবাদ ও বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম ইহার সাহায্যে পাঠকবর্গের প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞাত হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। আর আমরা যে কোথাও অত্যুক্তি করি নাই, কেদাররায়ের বীর্য্যবত্তার প্রকৃত পরিচয়ই দিয়াছি তাহাও বুঝিতে পারিবেন। সেজন্যই আমরা মূলের সহিত তাহার ইংরেজী ও বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম। ডুজারিকের বর্ণনা হইতে সেকালের যে সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সহিত বর্ত্তমানের কোনও সামঞ্জস্যই নাই, সেকালের শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমি লক্ষ্মীর পূর্ণভাণ্ডার সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে অতুলনীয় ছিল আর একালে তাহার কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে!

Le christianisme va s'etablissant be bien en mielc xz Royaumes de Bengala jusques a' I'an 1605.

Chapitre XXX.

Ez Royaumes de Bengalua il y aoit l'an 1601. quatre Peres de la compagnie, despartis en deux residences, l'vne estai an Royaume de Chandecan, là oú, commenous anons luacy dessus, fut bastie la premiere Eglise, que lesdies Peres ecrent en Bengala, qui fut si bien paurveeué darvemens, & de rares tableaux par la liberalitè des Portugais,

que c'estait vne tres-belle chose á voir. Le jour de la circoncision de l'annee suynante. qui estoit cely de sa dedicase, & de son patroc, elle sert parce is magnifiquement, que le Prince fils du Roy, de qui debuoit luy succedre, y vint accom- pagné d'vn autre fieu frere plus j eune que luy, par le commandement de leur pere, lequel aussi alla, suiay des plus grands de sa cour, de fut auec eux tres-content d' auoit veu vn si bel appareil, si ratifia de nouveau la promesse qúil auoit ja faicte aux Peres de leur faire bastir vie Eglise de piene, qui surpassast en eautè toutes celles de Bengala. Brief il se moastroit si affectionneen leur endroict qu'il sembloit prendre vn sinulier plaisir á leur octroyer tout ce qu'ils luy demadoient, quoy quils ne l'importunassent pas beaucoup : si ce n'estoit intercedant pour les autres, comme ils streut pour vn Portugais ; auquel il auoit faict satsu' ne gvliottee pour quelques debtes ; et bien qu'il eust refusè á plusieurs de ses sauoris de lascher prise neatmoins si tast que l'vn des Peres Ien requist, il la luy fit rendre. Les Peres aussile prierent pour vn Gentil, qui luy debaoit vne grasse samme d'argent ; laquelle il luy quitter á leur instance.

* * * * * *

Description de I' Isle de Sundiua ; de comme les Portugais se'n emparent ; d'ov le Roy de Aracan prend accsion de leur faire la guerre, de les traicte inhumainement.

Chapitre XXXII.

L' lle de Sundiua est fort proche de la terre ferme de Bengala, n'en estant eslqignè e que six lieues, viz á viz du port de **Siripur,** Elle est si forte de si bien reueopareè de

la nature, qu'il est presque impossible d'y aborder, sans le consentement des habitans. C'est pourquoy les Portugais jetterent l'oeil dessus pour s'en saisir ; faisons estat, si vne fais ils seu estoient rendus les moistres, de qu'ils s'y fussent bien fortifiez, d'avoir la vne retraicte asseurèe ; de on autre moyen d'entreprendre auec leurs flattes, de armees de mer sur les citez, de forteresses, qui sont tout le long de la coste de Bengala, de Pegu, de Martavan, de d'autres, sans que personne les en pent empescher : d'autant qu'ils sont d' ordinaire plus fortes sur mer, que les Roys de Princes de ceste contrée. Elle a aente lieues de ceieuet de parte grande quantite de sel, dont se pourvoit tout le Bengala, de partant de grand revenu, voire le principal de ces Royaumes. Que si les magasins, que les Portugais auoient en Chatigan de en **Siripur,** fussent este' transferez á icelle, c'eut est el' vne des plus celebres Isles, & de plus grand profit, qui fut esté eu l' nnde ; tant á cause du trafic de sel, a raison duquel plus de deux cens voisseaux y viennent, aborder chasque année, que pour les autres denrées, que portent ceux qui y vout pour les troquer avec du sel, Finalement elle estoit fort propre houry retire rtous les Portugais, de autres Chrestiens des Royaumes de Bengala, quand quelque persecution s' esteneroit contre ceux de la terre ferme : car ils eussent este soules lu protection des Portugais, autre qú il y a beaucovp d' Infideles, les quels il evt este aise a convertir, si les Portugais passent demeurez seigneurs d'icelle.

Céste Isle appartenoit de droict à vn des Roys de Bengala qu' on appelle **Cadaray** : maisily auoit plusieurs anné es qu'il n'en jouissoit pas, à cause que les Mogores s'en

Elle fut prise l'an 1602. par vn vaillant Capitaine Portugais, nomme Dominique Carualho natis de Montargil, qui estoit au service du mesme **Cadaray.** Il se saiste premierement de la forteresse, assistéde quelques soldats Portugais, qui l' aydoient en ceste enterprise. Mais soudain les naturels du pais l' assiegerent ; tellement que se voyant presse, il donna odvis aux Portugais, qui estoient en Chatigan, de ce qui se passoit, les priant de le vouloir secouri. Ce qu'ils firent en grande diligence, presant pour Capitaine vn Portugais homme d' honneur de mogens, nomme Emmanuel de Matos ; lequel estat alle' an secours avec quatre cens soldats, souta vistement eu terre, de donna vne bataille compale aux originaires : lesquels il mit á van de route, de en tua plusieurs. Par le moyen de ceste victoire, de le quelques autres, que les Portugais gaignerent depuis, ils demeuretent maistres de toute Iisle : laquelle Dominique Carualho de Emmanuel de Matos se departirent entre eux deux.

Le Roy de Aracan, qui audit receu tant de services des Portugais, de se monstroit si affectionnè eu leur eudrit, comme nous auons veu entendant ces nouvelles, s'offeuea fort, de ce que sans son cougé de permission, ils s'estoient saisis de ceste Isle, qui estoit saules sa protection : de craigrant que si d'vne casté ils se rendsient forts eu icelle, de de là utre qu'ils tiussent le port de Sirian, au Royaume de Pegu, lá oú desta ils auoient baster vne forteresse, ses terres qui sont entre deux n'en receussent du dammage, il resolut de les desnicher de là. A ceste intention il leve vne armie de cent cinquate Ialé as, qui sont certains vaisseaux fort legers à voile, de à rame, ayans treute auirons

eu tout, quinze de chasque casté. Là entroint encous quelques cut´us, de autres grands vaisseaux, tous bien equipez ; & armez de plusieurs fauconneaux, chamelaets, & autre forte d'artillerie.

Portugais s'en estoient emparez par force. Or quod il que les portugais s'en estaient saisis ; saisis, comme nous diraf s bien tort ; il la leur donna de sart bonne volunté reioncant en leur saveur á tour les droicts, qu'il y pouvuoit pretendre.

Il auoit aussi du caste´ de Siripur cent casses, qui soat d'autres vaisseaux de ce pays là, que le **Cadaray** luy fournissoit. Car ils s'estoiet tous deux liguez pour cet effect : de mariere qu'en tout il y auoit quelques deux cens cinquante vailes. Les portugais, de autres Chrestiens, qui estaient en Dianga, de Caranja, ayant seuty le vent de ces preparatiss, comencerent a s'embarquer das les nauiras avec tous leurs moyens : mais ceux de Chatigan quoy qu'ils se pouuoient bien doubter du maltalent du Roy d'Aracan : d'autant qu'il avoit facit un Edict, par lequel il deffendoit à tous les Mogos, ses vassaux de se rendre Chrestiens ; de mesmes avoit facit renier la foy à tous les Peguans de ses teues, qui s'en estoiet rendaz ; toutefois ils ne pouuoient bonement se persuader, qu'il lenr trumut vne telle trupisou : veu qu'il leur faisait tout de caresses à l'exterieur. Et pour ce ils ne se soncicient pas de mettae leurs hardes de moyens dans les navires, combien qu'ilsy mireat les choses, de plus grande importançe. Mais ce qui les endormoit le plus estoit, que le Roy de Chatigan, oncle de celay d'Aracan, par vn cry, public fit dire, qu'encore

qu'on entendist remuer quelques chose ez autres Badels qu'il ne falloit pas qu'on eut peur que l'on fit le mesme eu Chatigan : de pour 'mieux disstnuler son facit, il enuoyu on Sarrasin, homme de qualité, pour mettre des gardes au logis des Peres : afin, ce disoit il, qu'on ne leur sit aucun dammage, de de sa part les sit visiter par son grand caciz' on Prestre. Mais tout ce la n'estoit que feintise pour sur prendre les Partugais. Etde facit le 8. Novembre ils firent voguer leur arme´e a´ valla riviere qui vint foudre surle port de Dianga où estait Emmanuel de Matas dans vne faste, avec quelques Ialeas toutes pleiues de gens, qui commencoient de se mettre dans les nauires ; lesquelles de peur qu'on n'y mit le feu, auoient este´ ce mesme jour retire´es du lieu, où elles estaisert à l'anchre, de s'estoieat mises au large. Emanuel de Matos voyat les Mogo,se jetter sur sa fuste de sur les barques des Portugais requeroit les sundares. c'est ã dire, les Capitaines de l'arme´e ennemie, de ne van oir point les agasser : pais qu'ils n' estoient point rebells au, Roy d'Aracan leur Prince. Mais pour cela les autres ne desistciet point, de ce quils avoiet comeces si quils investirat les barques des Partugois, lesquelles estoiet si replies de ges de si mal equipies, que ceux qui estoient dedes les tirerent hars du cobat : tellemet que la seule fuste de meura au milieu de Iarme´e de Mogos ; laquelle ceux dededans deffendirent si vaillumment, qu'ils tuerent plusieurs des ennemis, do des leurs n'en mourast qu' vn, de en y eust sept de blessez, entre lesquels estoit Emmanuel de Matos,mais tons legerement. Le combat finit lors que la faste se fat despestre´e d'vne si grade,

multitude d'ennemis ; lesquels par ce moyen se rendirent, sous aucune resistance, maistres des quatre vaisseaux de Portugois, qui furent tous pillez, de succagez ceste victoire paussa tellement le menton aux Mogos qu'ils we tenoient plus de compte des portugais de tout ce jour l'a. de l'ensuguant ils re firent que boire,
manger, de yuroigner de se desportir entr'eux les marchandises des Portugois, qui estoient reste´es sur tene. Mais deux jours apres, qui fat le 10. Novembre, ils payerent bien l'esiot. car Dominique Carvaillo, qui tenoit I'Jle Sundicca, joignant fon arme´e avec celle d' Emmanuel de Matos, qui estoit au port de Dianga, assembla en tout quelques cinquante vaisseaux, entre lesquels estoient deux fastes, quatre caturs, trois barques, de le reste juleas. Avec ceste petite platte ils s'en vant tous deux le plus secrettemet qu'il fut passible trouuer lenenmy ; de sur les puict heures du matin. Donnerent detas l'arme´e des Magos, avec vne telle roideur, de courage, qu' ils curent bien tast le dessus, se rendirent les maistres de tous leus voisseaux, qui estoient cent quarante neuf en nombre, sans qu'il en eschappast aucun, horseuis vne petite barque. La` ils gaignereat grande quantite d'arquebuzes, de mansquets, douze grosses pieces d'artillerie, partie chamelets, partie fanconneaux. Ils tuerentvn grand seigneur des Mogos, qui estoit oncle du Roy d'Aracan, nomme Ginubodi, avec plusieurs autres. Car le reste se getta dans I'eau, de se sonua a` la nage, Brief its recounrereat toutes les personnes, de le bagage, qu'ils avoient perdu en la battaille passe´e.

Ceste victoire, qui fat sans aucune perte, u dammage des Portugois, accreust beaucoup leur pouvoir, destonna

les ennemis de telle forte, que les nouvelles en estant arrive´es a Chatigan, chascun chargeoit sur ses espaules ce quil auoit deplus precieux, de la Roy ne mesme, monte´e sus vn Elephant, print la suite. Car tans pensoient que les Portugois paursuyaroient leur poincte, de viendioient soudre sur la cite´. Ce que s'ils eussent facit, ils se fusset emparez de la forteress, sans espudre vne goutte de leur song : car elle estoit pour lors desnue´e de gens de deffence En quoy ils firent vne lourde faute. Au este, le Roy d'Aracan ayant veu comme ses desseins contre les Portugois luy avoient mal reussi, s'accammodant av temps, print vn meilleur advis, renouant l'amitie´, de l'alliance le General d' iceux, qui estoit Philippe de Briton, de avec Emmanu· el de Matas, de Dominique Caruallo.

*   *   *   *   *

Le Roy de Aracan avec vne arme´e de mille voiles, tasete de gaigner l'Isle de Sundieea sur les Portugais : le squels avec peu de forces le repoussent, de ayant eu le dessus, quittent de leur grel´ Isle, de se retirent a SIRIPUR, pais a Golin, la du Dominique Carvalho chef d'iceux est tratistreusement massacre, de toute la chrest iete de Chandecan destratic.

Chapitre XXXIII.

Le Roy de Aracan ayant pris a` cœur la conqueste de l'isle de Sundina, tant parce qu'il y alloit de son honneur, a` cause que l'arme´e qu'il y anoit enuoye´e fut mise en route, que pour l'importance d'icelle, a` raison du profit, qu'il pensoit en retirer, ne cessoit de chercher tous les moyens, qu'il ponnoit, pour l'oster des mains de Protugais ;

jellant anssi l'acil sur la conqueste des autres Royaumes de Bengalá. A ces fins il fit de grands preparas tifs, si qu'il assembla vne flotte de mille voiles, dont la pluspart estoient Ialeas. combien qu'il en y anoit encore de plus grandes, come de caturs, & autres qu'on appelle cosses. Avec vne si grosse puissance l'Admiral de ceste flotte tira droit a'l Isle de Sundina ou estoit Dominique Carvalho, lequel n'anoit en tout que cinquante Ileas, quatre caturs, & un naniflotte de l'ennemy parust, qui sembloit conurir toute la mer, la pluspart des voiles Portugaises se retirent: de facon que Carvalho resta seulemet avec son nauire, & autres quinze vaisseanx : mais comme il estoit homme vaillant & courageux : il resolut d' attendre l'ennemy avec ce pe-u de forces qu'il anoit. Cequ'il fit, & le combatil si valeureusement, que depuis vne heure apres midy, que la meslée commence, jusques a' Soleil couche, il he tourna jamais le doz. batailant tousiours avec vne telle roideur & impetuosité, qu'il faisoit esbahir les ennemis. Il anoit quant & soldats, & onyr de confession tous ceux qu'il ponnoit, taul que la bataille dura, la quelle setermina avec le jour : & Dien voulut pour la confusion des Infidelles, & pour la gloire de son sainct nom, que les Chrestiens inuoquoient, & a' la manifestation de la vortu de sa saincte qui paroissoit en leurs estédards, qu'encore que le nombre croin des vaisseaux de Chrestiers fut sans comparaison beaucoup moindre que Celuy de ennemis, n'estant que seize contre mil-neantmoins la victoire demeurast de leur coste : si qu'ils rompirent la flotte du Roy de Aracan, mettant a' fonds plus ed cent vaisseaux d'icelle, & brustat quelques trente zoens, qui sont comme des grands Caturs. Quant

aux morts ou tient qu'il y eut plus de deux mil barbares, qui y demeurerent ; mais des Chrestiens il n'en mourut que six ou sept. Les ennemis ayat esté si bien leattus, se retirerent á leur courte honte. Dont le Roy de Aracan fut li falsché, qu'il fit vestir en femmes plusieurs de ses Capitaines, les punissant avec vn tel affront, mesmes de ce qu'ils ne luy auoient amené aucun Portugais ou mort ou vif.

Or quoy que la vicitoire fut demourée aux Portugais : neautmoins il se trouverent si despourueus be meeritions querre, pour reparer & pourvoir leurs vaisseaux, qui anoiet esté aq conflct (car les autres, qui en anoieut suffisamment ne s'estoiet tronuez en la mestée) qu'ils jugerent ne soustenir vn autre Chocsemble, siles ennemis venoient les poxuoir attaquer de rechef. De facon qu' ils resolurent de quittre l'isle de Sundiua pour vn temps, veu qu' ils n'aouoient fors moyen de la deffendre pretendans lu reconurer vne aqtre fois á quelque meilleure occasion. Donc ceste mesme nuict ils S'embarquerent tous, tant Portugais que aqtres Chrestiens originaires de ceste Isle, qui estoient desia beaucoup, & le Pere de la Compagnie aussi, avec les ornemens de l' Englise. (Car desia lesdits Peres auoient commence d'y bastir vne Englise & maison meuant quant & luy plusieurs jeunes garcons & petits enfaus Chrestiens, pu'il instruisoit & se retirerent tou en la terre ferme, se dispersans ez pais de **Sripur**, Bacala, & Chandecan, la' ou' le Pere Blaise Nugnez se joignit avec les autres trois de la mesme Compagnie, demeuras á aleur maison de Chandecan, qui estoit lors restée seule en Bengala, toutes les autres ayant esté ruinées. Et Croyoient lesdits Peres,

qu'en ce lieu ils seroient plus en repos pour estre fort eslgig fort esloigue´des terres du Roy de Aracan. Mais il en aduint autrement. Car ledit Roy enorgueilly di avoir retire´ des manes de Portugais l' Isle de Sundicca & desirant poursuijure son dessein, qui estoit de conquestehr tous Royaumes de Bengala, il se jetta sondian sur celuy de Bacala, duquel il se saisit sans difficulte, le Roy en estant absent, & encor jeuue. Apres cela il voulut aller fondre sur celuy de Chandecan ; mais anant que ce faire, quelques autres choses survindrent, qui accreurent beaucoup la renomme´e Dominique Carvalho : lequel en ces eutrefaictes estoit au port de **Sripur**, ou´ il S, estoit retire, aprs avoir quitte´ l' Isle de Sundiua, & Y fut bien recu du Seigneur de ce Pais appelle **Cadary.** Il anoit lors trente Iale´as, toutes prestes pour faire quelque bel exploit de guerre. La´dessus voicy qu'en vne matine´e, que fut le 28 Auril, vne flotte de cent vaisseeux, qu'on appelle Cosses, commence de paroistre sur mer. C'estoit vne arme´e qu'envoyoit Manasinga Gouverneur ou Viceroy de ces quartiers, pour le grand Mogol le quel paretendoit Conquester tout ce pais, & a cet effet y tenoit des grosses arme´es depuis quelque temps.

On ceste flotte estoit principalement enuoye´e contrele **Cadary**, and anoit pour Admiral vn Gentil, nomme´ Mandaray, tres-vaillant homme, and fort redonte par toutle Bengala. Si tost que Carvalho vit ladicte arme´e venir contre luy, jugeant que ce lusy seroit vn grand deshonneur de tourner les espanles a vne flotte de cent voiles, quoy qu'l n'ent que trente Jale´as, veu qu'avec seize vaisseaux, il eu auoit mis en route mille vn pen auparavant, il donna

si furieusement sur l'ennemy, qu'en pen de temps il eut rompu troute son armée, mettant á fond force vaisseaux, & tuant beaucoup de ges d'icelle. La mourut I' Admiral Mandaray, lequel tomba de la houppe de son nauire blessé ble á la teste. Il est vray que ceste victoire ne fut pas sans me Dominique Carvalho fut atteint d'vn coup de gaignee fleche au gouzier, dont il fut en danger de perdue la vie.

Quelques jours apres Carvalho estant revenu a convalescence, s'en alla de **Sripur** á Goli ou Gullo, qui est come vne colonie des Portugais a mont la riviere, oú est le petit port, qu'on appelle, de Bengala esloignée d'iceluy 50, licues, pour se refaire illee, ayat intention d'aller attaquer les gens du Roy d' Aracan : fid reconutur l'Isle de Sundicca. Estant lá eut vn antre heureux rencontre, & non guere moindre en sa facon que les passez. Car les Mogores, qui tiennent ce pais la, pour mastiner dauntage les Portugais, qui dez long temps demeurent en ceste colonie, oú il y anoit quelques cing mil personnes, les vo ilurent contraindre á payer de nouveaux tributs & impositions. A ceste cause ils bastirent en ce temps la prez duáit lieu vne retourner avec sa ffotte contre les Mogos, & retirer de leurs mains l' Isle de Sundiva le Roy d' Aracan apres s'estre emparé de ladicte Isle & du Royaume de Bacala ainsi qu'a esté dit, sen' alloit fondre sur celuy de Chandecan, pour l'envahir aussi. Le Roy de Chandecan voyant qu'il vaudroit nieux user finesse, pour se forteresse le long de la riviere, la oú ils tenoient en garnison quatre cens soldats Mogores, lesquels aussi fouloient & tyrannisoient estrangement les Chrestiens

originaires du pais. Car en passant avec executant leurs vaisseaux par la riviere, ils les destroussoient, & mesmes en tuoient plusieurs, executant sur eux des cruantez si horribles, qu'on ne les peut escerire. Voulant donc faire le mesme a´ Dominiuue Carvalho com'il passoit avec ses trente Ialeas denarrt leurf orteresse eeux qui estoient dedaus commencent a luy tirer force arquabuzades. Carvalho ne pouvant endurer vne telle branade, faure promptment a´ terre, avec 80 soldats Portugais & du premier abroad se sasit de la fortresse, & quelques autres montent parles mu & entrent dedans, ou ils firent vn tel carnage des ennemis, que de quatre cens soldats qu'ils estoient, il n'en eschappa qu' vn seul, qui estoit Caffre pe nation, lequel sortit dehors par vn canal. Ces exploits de querre rendirent le nom de Carvalho si redoutable en tous les Royaumes de Bengala, quen songeant seulemel de luy, ils estoient tous saisis de frayeur. ce qui aduint vne vne fois a´ un Capitaine, d,vne flotte de cinquante Iuleas des mogos, subjects du Roy d' Aracan, leuhel estoit a´ l'embouchеure d'vne riviere : & ayaut songe de nucit que Carvalho les venoit attaquer, il mit tellement la paur au ventre des aqtres, que toute l'arquellu arriva au lieu ou´ estoit le Roy : lequel ayant scen la chose, fit trancher la teste au Capitaine, a´ cause quil anoit pris si legerement p'espounante, & l' anoit donne´e aux autres.

Jusques icy P'heur & la prosperite´ anoit accompagne´ le Capitaine Carvalho : mais comme les choses de ce monde sont variables, Dieu pour nous apprendre nu'il ne s'y faat pas trop fier, quand elles nous succedent a´ souhait, ou bien pour autres canses cache´es en ses divins & secrets jugemens,

permit que les affaires se changeassent, de maniere qu'il vint á estre pris & massacre, par ceux desquels moins il se doubtoit. Car estant á Gullo occupé á reparer ses vaisseaux pour garantir d'vn tel danger : quoy que ce avec la perte de ses amis. Scachant donc combien le Roy d' Aracan estoit offence contre Carvalho, & combien il le redoubtoit, delibera de s'en saisir ; afin d'appaiser la cholere du Roy avec sa teste, & de ceste sorte conserver son Royaume : comme de fait il arriva. Or afin de venir plus aisé ment a bout de son dessein, il ennoya de ses gens á Carvalho, luy offrint de tres-teas partys, s'el le voluoit assister de secours contre le Roy d' Aracan. Carvalho estima fort ces offres, croyadt que par ce moyé satisferoit aux obligatio's qu'il avoi'it pour d'autares respects audi't Roy de Chandecan, : de qu'apres il obtiendrot facilement secours de luy contre le Roy d' Aracan : tellement qu'an plustost il s'en alla le touver, men ant quant & luy trois nauires bien armez & equipez, six Caturs. & cinquante laléas, avec vne bonne troupe de braves soldats. Le Roy luy fit vn fort honorable accueil & luy monotra des signes extraordinaries de un veillance, luy donnat vne rabe de brocat d'or, & un cheval de grand prix. Bref il luy promit qus das trois jours il le pouruoir-roit de tout ce qu'il faudorit, pour aller contre le Roy d'Aracan. Mais il en passa quinze, sans qu'il luy parlat de cela : ains au mesme temps il s'accorda secrettement avec le Roy d' Aracan suquel il promit la teste de Carvalho, pournen qu'il desistat de luy faire la guerre.

Or comme ces deláps, & autres signes qu'on voyoit, desconuroient de plus en plus le venin, que le Roy de

Chandecan tenoit caché dans son cœus, les autres Portugais, & principalement lds peres de lo compagnie, qui estoient là, conseilloient a Carvalho de se retirer en quelque lieu de senrete, jusqu'à ce que l'ou veid plus clairement qu'elle estoit l'intention du Roy, & que de là il pourroit traicter des affaires avec luy, par tierces persones, se gardant bien de retourner en sa cour, avant qu'on eut sondé ce qu, il machidoit en son cœur. Car le brinct common parmy les Gelils estoit, que la Roy vouloit tuer Carvalho. Mais jamais il na fut possible de luy persuader cela ; ains pour complaire à quelques vns de ses Capitaines, il s'en alla trouvar le Roy à lasor, où il fut trois jours sans ponuoit avoir avdience de luy. Et les excuses de ce refus estoient si irodes, qu'elles estolent assez bestantes pour desabusir Carvalho. Au bont de trois jours le Roy ayant tout prepare pour executer son entreprise, Carvalho vint au Palais, accompagné de quelques Portugais. Si tost qu'il fut entre par la derniere porle, ou la ferme sur le nez aux autres, qui le suynoict : lesquels furent incontinent saisis & desponiltes, tant de leurs armes, que des accoustremens qu'ils portoient, avec vne grande cruanté & indignité, leur donnant avec ce force coups de poing ; & finalement ou leur mit les fers aux pieds. Apres cela le Roy ayant mandé qu'on montral Carvlho sur vn Elephant, il le fit conduire ailleurs par vn sien Capitaine, accompague de quatre ces soldats, qui le menoiét avec des grádes huees & mocqueries ? comme se glori fians de la proye, qui estoit tombée entre leurs mains, avec luy estoient aussi menez quelques autres Portugais, Ou ne scait point pour l' asseuré ce qu'on fit endurer

audit Carvalho, & á ses compagnous avant leur mort, ny combiende tempts its surues quirent aprds leur apres teur prise : seulement il est asseuré qu'ils furent pris, la houvelle en vint aux Portugais, & autres Chrestiens. de Chandecan, laquelle arrivant a minuict. causa va tel trouble parmy eux, qu'ils ne scauoient quel conseil prendre. Les uns estoient d'aduis que tous s'embarquassent, avec ce quils anoient de plus precieuv, dan les nauires & vaisseaux de la flotte de Carvalho qui estoint lá & qu'ils descendissent an plustost á val la riviere, & c'estoit le plus asseuré. D'avtres au cótraire disoient, qu'encore que le Roy voulut se végér de Carvalho, pour quelxues desplaisiru q'il anoit receus dd luy toutes fois que son cocroux ne passeroit pas plus onter, pour se descherger sur des innocés, qui qui ne luy anoient fail aucun fort ny desplaisir : ains beaucoup de services, and qui luy apportorent vn grand profit, ceste opinion fut trouvée la meilleure : de facon que tous la suyiurent, and s'arresterent lá, sans prenoir les afflictions and traverses, qui leur arienrdet bien tost apres. Car soudian que les Patanes sarrasins, que se tenoient auprez du Bandel de Portugais, and leurs plus grands ennemis, eurent le vent de ceste nouvelle, ils commencerent ceste mesine meict á brusler. & piller tout ce qui ppartenoit anx Portugais ; & s'ils en trounoient quelqu'vn á l'eseart, ils lesgorgeoient. Apres cela ils vindrent á la maison de Peres, qui estoient lors quatre, pensans y faire quelque grand butin : mais les Portugais qui s'assemblement á la yorte, leur empescherent l'entrée avec les armes.

Le lendemain le Roy manda, qu' on se saist de vaisseaux de la flotte de Carvalho, & des Portugais encor, avec leurs armes, & bagage, les faisant despouiller. & mettre en vne prison tres-estroicte. ou ils endurereient beaucoup de de panuretez, & miseres, n' attendant de jour a autre, que l' heure de leur mort, laquelle ils anoient a chasque moment denant yeux. Car incoutinent apres qu'ils furent pris. le Roy fit trancher la teste a deux d' iceux, & en fit tuer autres deux a coups de janelot fort cruellement.

Les peres de la compagnie ne furent pas faicts prisonniers : mais ils endurerent beaucoup, voyans les autres en si grande desstresse : & ne ponuans les seconrir quant au corps, ils faisoient tout ce bui leur estoit possible pouy le salut de leurs ames, onyat de confesslon tant ceux, qui estoient en prison que les autres qui ne l'estoient pas. Et par ceque les Gentils voyant les peres parlar en secret aux Portugais, lors qu'ils se confessoient, prenoient cela en manuaise part, & croyoient que les Peres leur conseillassant de ne payer pas au Roy certaine somme d'argent qu'il leur demandoit, ils leur firent beaucoup d'affronts, & les rudoyerent fort de paroles : voire ils allerent a leur logis, & renuerserent toui ce qu'il y anoit sans dessus dessoubs, ne ponuans se persuader qu'ils n'y tronuerent ny l'vn l' autre. Nonobstant cela le Roy leur enuoya dire par plusievrs fois, qu'ils sortissent tons de ses terres, & qu'il ne vouloit point qu'il y eust des prers desormais. Caey dnra l'espace d'vn mois entire, jusbu'a ce pue les prisonniers payerent leur rancon, qui fut de trois mil pardaos. Les. Peres de la Compagnie voyant toutes les Englises, & les croix par terre, & que le Roy ne vouloit point permettre,

qu'ils demeurassent la d'avantage, deliberent de s'em relourner en l' Inde Mais la dessus arriva vn mandement de leut Provincial, par lequel il ordonoit, que deux d'iceux s'en allassent an Royaume de pegu, & que les autres deux s'en revinssent a Cochin , puis qu'en Bengala les affaires du Chrestianisum estoient si deplorz & en si pauvre estat. Ce qui fut execute, comme nous dirons au chapitre Suynant.

CHAPTER XXX.

In the kingdom of Bengal there was in the year 1601 four Fathers of the company, living in two places, two of them were in the kingdom of Chandecan, where, as we have already said, the Fathers in Bengal built the first church which was so well decorated with pictures by the liberality of the Portuguese that it was very beautiful to look at. The day of circumcision of the following year this church was decorated so magnificently that the Prince, heir-apparent to the throne, accompanied by several of his younger brothers, went to see it by command of his father. The king himself also went and was accompanied by a large number of his courtiers, on that day he again renewed the promise, already made to the Father, that he would help them to build a church that would be the most beautiful in Bengal. In fact the king was so affable that he seemed willing to grant to the Fathers whatever they asked. So that as soon as one of the Fathers asked him to set free one of his Portuguese debtors, he did so. The Fathers even interceded for a Gentile debtor who owed him a large sum. He remitted the debt at their instance. Description of the island of Sundiva; the Portuguese take possession of it; for which reason the king of Aracan wages war against them and treats them cruelly.

CHAPTER XXXII.

The island of Sundiva is very near Bengal, being only 6 leagues from the part of **Siripur**. It is naturally so well protected that it is impossible to approach it without the permission of the inhabitants. For this reason the Portuguese wanted to take possessions of it. They could, if they were masters of it, construct there a safe and well fortifiied retreat, whence they would be able to attack, with their navy, the cities and fortresses on the coast of Bengal, Pegu, Martavan, and other places none could hinder them, since on the sea they were superior to the kings of those countries. There was found in this island a large quantity of salt which was exported to Bengal and was a source of considerable revenue. Whatever ammunitions the Portuguese had in Chatigan and **Siripur** were transported to the island, one of the most beautiful and profitable islands of India, as much for the salt-traffic by reason of which more than two hundred vessels go there every year, as for the other commodities which are imported there to be basterd for salt. Finally it was a good place of shelter where all the Portuguese and other Christians of the kingdoms of Bengal could retire when a persecution against them broke out.

This island belonged by right to one of the kings of Bengal who was called **Cadaray**. But during the last few years it had been in the possession of the Mogores.

It was taken in 1602 by a brave Portuguese captain named Dominique Carvallio born at Montargil, who was in the service of the same **Cadaray**. He seized first of all the fortress and was helped by some Portuguese soldiers in this enterprise. But suddenly the natives of the country attacked him so vigorously that finding himself hard pressed, he asked the Portuguese of Chatigan to help him. Tho Portuguese readily acceded to his request and sent to his aid a Portuguese Captain named Emmanuel de Matos with four hundred soldiers, These gave battle to the natives of whom several were killed and the rest put to flight. By means of this victory as well as others which followed the Portuguese became the masters of the island, which was divided between Dominique Carvalhio and Emmanuel de Matos.

The king of Aracan who, had been hitherto well disposed, was angry that the Portuguése had taken the island without his pérmission. He feared that if they were masters of the island, holding as they did from the King of Pegu the fort of Sirian, where they had already built a fortress, his own lands would lie between these two places, so he resolved to dislodge them from there. With this purpose in view he levied an army of 150 *Jaleas*, which are boats, easily propelled by sails and oars, having 30 oars in all, 15 on each side. These were also some other boats, all well equipped, and supplied with pieces of artillery of different kinds.

On the Siripur side he had 100 boats, supplied by **Cadaray**. For they were in league for this purpose ; so

that altogether there were about 250 vessels. The Portuguese, the other Christians who were in Dianga and Caranja, having got scent of these preparations, began to get on board with all their belongings. But those of Chatigan dreaded the king of Aracan ; because he published by which he forbade the Mogors to become Christians. He had also obliged the Peguans to repudiate their faith. What quieted their suspicion was that the king ot Chatigan, uncle of that of Aracan, had proclaimed by an edict his friendship for the Portuguese. But all this was mere hypocricy to take in the Portuguese. On the 8th November they made their army sail down the river to the port of Dianga where Emmanuel de Matos was in a fortress and had some boats manned by soldiers. These began to put themselves in order in their ships. Emmanuel de Matos saw the enemy surround his own fortress and ships. He fouud it difficult to resist their progress. The Portuguese killed some men on the enemy's side ; of their own men several were wounded, Emmanuel de Matos being one of them. The combat resulted in the surrender of the fortress and several Portugese vessels. The enemy were so proud of this victory that they seemed to despire the Portuguese whose merehandise they looted. But two days later Dominique Carvallio who held the island of Sundicca joined Emmanuel de Matos at Dianga. These two men approached the enemy as secrey as possible and surprised the army of the Mogos in the early morning. The attack was so successful that the Portuguese became masters of forty-nine of the

enemy's vessels which contained a large supply of different kinds of artillery. They killed Ginubodi uncle of the king of Aracan, with several others.

This victory was achieved without any loss, and it increased the power of the Portuguese so greatly that when the news reached Chatigan the people took everything valuable they had and fled. Even the king himself left the city. For, they all thought that the Portuguese were coming to sack Chatigan. So that the fortress was taken very easily. The king of Aracan, at last, thought it best to mind his alliance with the Portuguese.

The king of Aracan with a fleet of one thousand boats tries to conquer the island of Sundicca. A small force of Portuguese soldiers repells him. The Portuguese then voluntarily quit the island and retire to **Sripur** Dominique Carvallio is treacherously massacred.

CHAPTER XXXIII.

The king of Aracan decided to conquer the island of Sundiva, both because it was a point of honour since the army he had sent there was put to flight and also because the island would be a source of income to him. With this object in view he made great preparations and collected a fleet of 1000 vessels. With this fleet the Admiral sailed straight to the island of Sundiva, where Dominique Carvallio had in all fifty vessels. When the Aracan fleet appeared it seemed to cover the whole sea and the majority of the Portugues vessels retreated, so that Carvallio remained there alone with his ship and fifteen other vessels. But he was a courageous man and determined to await the enemy, though the force at his command was very small. He fought so valliantly that from one o'clock after mid-day till sunset he did not once turn his back to the enemy, but surrounded them. The battle terminated with the day and God caused confusion among the enemy and glorified His Holy Name and the power of His Holy Cross which appeared on the Christian banner. For the number of vessels which the Christians had was incomparably much less than that of the enemy, being only sixteen against a thousand. Nevertheless victory was on the side of the Christians. Of the enemy more than two thousand were killed, while the Christians lost only six or seven. The enemy being thus beaten retreated to their shame without carrying with them any captives. The king of Aracan was so annoyed that he

insulted several of his captains by causing them to be dressed as women.

Now although the Portuguese, were victorious, yet they were now so badly supplied with ammunition of war and so badly required to repair the vessels that they thought they could not sustain another battle if the enemy thought fit to attack them again, so that they determined to leave the island of Sundiva for a time. Therefore all the Portuguese as well as the native Christians who were already numerous, and the Fathers of the company also together with the decorations of the church (for already the Fathers had begun to construct a church there) departed quickly and settled in Siripur, Bacala and Chandican, where Father Blaise Nugniz joined them. They too lived in the house at Chandican which was the only one still in existence in Bengal, all the other houses having been destroyed. The said Fathers believed that in this place they would enjoy repose and be far from the king of Aracan. But the said king emboldened by his conqnest of Sundiva and wishing to pursue his design of conquering all the kingdoms of Bengal, suddenly invaded Bacala which he conquered without any difficulty, the king being absent and still very young. After this he thought of invading Chandecan; but before doing that, he had to attend to other things, which added much to the fame of Dominique Carvallio, who was at the port of **Siripur** whither he had gone after having quitted the island of Sundiva, where he was well received by the chief of the country named **Cadaray**. He had then thirty

boats (Jaleas) all ready for a good exploit of war. In the morning of the 28th of April a fleet of a hundred vessels appeared on the sea.

This was an army sent by Manasinga, Governor or Viceroy of those quarters, for the Great Moghul who aspired to. conquer the whole country, and for this purpose had reserved there a large army for sometime.

This fleet was sent chiefly against **Cadaray** and was under the command of a gentle Admiral named Mandary, a very brave hero and resided in Bengal, Carvallio attacked this fleet so impetuously that he routed the whole army in a very little time and killed many of the enemy. Admiral Mandaray was wounded in the head and died. It is true that Dominiqne Carvallio won this victory at the risk of his life for he was wounded in the throat by an arrow and for a time was in danger of losing his life.

When, a few days after Carvallio was brought to a state of convalescence, he went away from Siripur to Goli or Gullo, which is a sort of Portuguese colony up the river where there is a little port about fifty leagues from Bengal. The Mogors who held this place in order

to subdue the Portuguese living in this colony sought to make them pay tributes and impositions. They wristed the island of Sundiva. The king of Aracan having taken possession of this island as well as the kingdom of Bacala proceded to invade Chandecan also. The king of Chandecan saw that it would be better to use fiscesse. He had a fortress in which there was a garrison of four hnndred Mogor soldiers who persecuted bitterly the native Christians of the place. For they practiced dreadful cruelty upon the Christians and put many of them to death. They wished to do the same to Dominique Carvallio and the soldiers in the fortress fired upon Carvallio as he was passing with his thirty boats, who was unable to endure this cannonade and landed with eighty Portuguese soldiers and at once took possession of the fortress and made captives all the four hundred Kafri soldiers. This exploit rendered the name of Carvallio so dreaded throughout Bengal that people trembled at the mere mention of his name.

Until this moment prosperity had accompanied Captain Carvallio ; but as the things of this world change, so God in order to teach us that we should not be proud when our wishes are fulfilled or for any other cause that may be concealed in His Divine and sent Judgment, permits things to change so that he who was once dreaded nuiversally should be taken and massacred. He was occupied at Gullo with repairing his vessels. He knew that the king of Aracan was his deadly enemy and that he would like nothing better than Carvalho's death with a view to attain this end, he sent his people to carvalho inviting him

to a party in order to devise means of invading Aracan. Carvalho thought that by this means he would be able to discharge the obligation that he owed to the king of Chandecan, from whom he expected to receive help against the king of Aracan, so that he went on a visit to the king of Chandecan with only three ships, six catustress and fifty Jaleas (catustress and Jaleas are different kinds of boats) and a troops of brave soldiers. The king received him very honourably and showed him extraordinary signs of respect giving him a robe of gold and a horse of great price. He promised Carvalho that in three days he would furnish him with the necessary means of invading the king of Aracan. But fifteen days passed and nothing was done; at the same time he was secretly communicating with the king of Aracan to whom he promised Carvalho's head.

The Portuguese and chiefly the Fathers of their company who were there advised Carvalho to go away to a place of safety until the real intention of the king could be clearly discerned and that from there he could treat of affairs with time by means of third persons. For the Portuguese suspected that the king wanted to kill Carvalho. But Carvalho could not be made to believe this. On the other hand he went away to see the king at Jasor, where he spent three days without being able to get an interview with him. And the excuses for this refusal were so unreasonable that they were sufficient to disabuse Carvalho, when at last the king had got ready every thing to carry out his purpose, Carvalho went into the palace accompanied by some Portuguese. As soon as he entered

the doors were shut; they were immediately seized and their arms were taken away and they were subjected to great cruelty and indignity. Some even gave them slaps and they were bound in chains. After this the king ordered that Carvalho be exhibited on an elephant. Captain assisted by many soldiers led him out in the midst of shouts and mockery, with him were led several other Portuguese. It is impossible to describe the suffering to which they were subjected. It is enough to say that they were taken and that the news reached the Portuguese and other Christians of Chandecan. And the news arriving at midnight caused such confussion among them that they did not know what to do some were of opinion that they should take all their valua'bles and sail in ships and boats of Carvalho's fleet and sail as quickly as possible down the river others were of opinion that Carvalho had personally incurred the king's displeasure for which reason the king wanted to punish him, so that those who were innocent had nothing to fear. This opinion was followed and the Portuguese continued to stay without thinking of the affliection that was in store for them. The Patanes began by setting fire to Portuguese houses and looting all that they possessed. They killed any Portuguese whom they found alone. After that they went to the house of the four fathers, thinking they would get a lot of booty there. But the Portuguese had already assembled there and prevented the Patanes from entering into the house.

The following day the king ordered that Carvalho's fleet should be seized and that the Portuguese should be made

prisoners after taking away their arms and baggage. This was accordingly done and the Portuguese prisoners were subjected to unspeakable misery and deprivation, expecting death at every moment. In fact the king had some of them beheaded and the others killed very cruelly by javelius.

The Fathers of the company were not made prisoners but the sight of the suffering of others caused great distress to them. And not being able to help them physically they did all in their power for the salvation of their souls, hearing the confession of such of them as were in prison and also of those who were still free. While the gentles saw that the Fathers were speaking in secret to the Portuguese though they only heard their confessions, it was suspected that the Fathers were advising the Portuguese not to pay the sum of money that the king had demanded of them. Under this suspicion the gentiles insulted the fathers and spoke to them very insoloently then they went to their house and put everything in desorder. The king sent word to say that the Fathers should altogether go away from his kingdom, for he did not want any Fathers. This state of thing continued during an entire month until the prisoners paid their ransom *vis* hree thousand *pardaos*. The Fathers of the company seeing all the churches and the crosses pulled down and being ordered to leave the king's dominion, prepared to go away. But an order reached from their superior that two of them were to go to the kingdom of Pegu and that the other two should go back to Cochin. The state of Christianity in Bengal was then very deplorable. This order was carried out as we shall see in the following chapter.

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিংশ অধ্যায়।

১৬০১ খ্রীঃ বঙ্গদেশের দুই বিভিন্ন স্থানে চারি জন পাদ্রী বাস করিয়াছিলেন। দুইজন চ্যাণ্ডিকান রাজ্যে আবাস স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এস্থানেই তাহারা সর্ব্বপ্রথমে গির্জ্জা স্থাপন করেন, উক্ত ধর্ম্ম-মন্দির পর্ত্তুগীজগণের বদান্যতা প্রভাবে বহু চিত্র ইত্যাদির দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। এই জন্য উহা অত্যন্ত সৌন্দর্য্যদায়ক হইয়াছিল। পরবৎসর এক পর্ব্বদিনে গির্জ্জা গৃহ অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সে দিবস যুবরাজ তাঁহার কতিপয় কনিষ্ঠভ্রাতাগণ সহ রাজাদেশে গির্জ্জাঘরে গমন করিয়াছিলেন এমন কি স্বয়ং নরপতিও বহু সংখ্যক অমাত্য-বৃন্দ-পরিবৃত হইয়া একদিন উক্ত গির্জ্জা দেখিতে গিয়াছিলেন, সে দিবস তিনি পুনর্ব্বার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিলেন যে খ্রীষ্টানগণ বাঙ্গালা দেশের মধ্যে যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা একটী শ্রেষ্ঠ গির্জ্জাঘর প্রস্তুত করিতে পারে তদনুরূপ অর্থ সাহায্য করিবেন। রাজা পাদ্রীগণ যখন যাহা প্রার্থনা করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহাদের সে বাসনা পূর্ণ করিতেন। এমন কি একজন পাদ্রীর অনুরোধে পর্ত্তুগীজগণের কোন ব্যক্তির ঋণ মুক্তির ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সনদ্বীপের বর্ণনা, পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক তাহার অধিকার, এজন্য আরাকান রাজের সহিত যুদ্ধ ও পর্ত্তুগীজগণের প্রতি তাঁহার অত্যাচার।

*　　*　　*　　*　　*

সনদ্বীপ বঙ্গদেশের অতি নিকটবর্ত্তী। ত্রিপুরা হইতে মাত্র ছয় লীগ (৯ ক্রোশ) দূরে অবস্থিত। প্রাকৃতিক সাহায্যে উহা এমনি সুরক্ষিত যে উহার অধিবাসী বৃন্দের অনুমতি-ব্যতীত উহাতে প্রবেশ লাভ অসম্ভব। এই নিমিত্তই পর্ত্তুগীজগণ ইহার অধিকার লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজগণ ইহা স্বাধিকারভুক্ত করিতে পারিলে অনায়াসেই তথায় সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ নিরাপদ হইয়া বঙ্গদেশ পেগু, মার্ত্তাবান, এবং অন্যান্য স্থান সমূহের সৈকত-সন্নিকটস্থ বন্দরাদির উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইত,কারণ তৎকালে সামুদ্রিক আধিপত্যের খ্যাতির জন্য পর্ত্তুগীজগণ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। নৌযুদ্ধে তাহারা অন্যান্য রাজন্যগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল, নানা দেশে প্রচুর পরিমাণে লবণ রপ্তানী হইত ইহাতে সনদ্বীপের আয়ের একটী প্রধান কারণ ছিল। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যে সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র এবং পণ্যদ্রব্যাদি রক্ষিত ছিল সে সকল উক্ত দ্বীপে আনিত হইলে উহা একটী অতি প্রসিদ্ধ বন্দরে পরিগণিত হইতে পারিত। প্রতিবৎসর দুই শতেরও অধিক বাণিজ্য-পোত লবণ বোঝাই করিবার জন্য এখানে আসিত। অপর পক্ষে খ্রীষ্টাণ গণের আশ্রয়ের পক্ষেও ইহা নিরাপদ ছিল, কারণ বঙ্গদেশে খ্রীষ্টাণগণের প্রতি কোনও রূপ অত্যাচার হইলে তাহাদিগকে এখানে আনাইয়া অনায়াসে নিরাপদে রক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত।

(অন্যান্য অধ্যায় সমূহের বঙ্গানুবাদ মূল গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে।
৩৬-৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মহাপুরুষ চাঁদরায় ও কেদাররায়ের পূর্ব্ব পুরুষগণ সেনরাজবংশের পতনের পরেই বিক্রমপুরে আধিপত্য লাভ করেন। চাঁদরায় কেদারায়ের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে গুণধর খাঁ, মহেশ রায়, মুরারী রায়, রূপরাম পত্র নবীশ, রতিনাথ রায় ও পণ্ডিত বিশ্বনাথ পত্রনবীশ প্রভৃতি তাঁহাদের মুখ পাত্র ছিলেন। মোগল সেনাপতি মানসিংহ কর্ত্তৃক কেদার রায় পরাজিত ও নিহত হইলে বৈদ্যবংশীয় ভরদ্বাজ গোত্র প্রভব রঘুনন্দন পত্র নবীশ সমগ্র বিক্রমপুর পরগণার জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হ'ন। ইহার পৌত্র রঘুরাম রায় বিক্রমপুরের সমাজ-পতিত্ব লাভ করেন এবং বিক্রমপুরে বিশেষ খ্যাতিমান হ'ন। এখনও তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ একটা ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়।

রামমাণিকের লাঠি।
রঘুরায়ের মাটি॥
উঠ্‌লে লাঠির ডাক্
দৌড়ে পালায় বাঘ॥
গুল্লিফিরে ঝাঁকে।
রামের লাঠির পাকে॥
মাণিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাঁটি॥

ঘটক-কারিকায় ও ইহার সম্বন্ধে বহু কথা লিখিত আছে।

কালিদাস ঢালী ও রাম রাজা সর্দ্দার—ইঁহারা পূর্ব্বে দেওভোগ ও মুলপাড়া গ্রামে পৃথক দুই তালুক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতেন। উক্ত দুই গ্রাম নগরের নিকট অবস্থিত ছিল উভয় গ্রাম বহুদিন হইল পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ঢালি কালিদাস মুখটির বংশধরগণ দেওভোগ ভাঙ্গিয়া গেলে পর চন্দনি গ্রামে ও বালুচর গ্রামে বাস করিতে থাকেন।

কালক্রমে চন্দনি গ্রামে নদীতে ভাঙ্গিয়া গেলে উপসী গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করেন। বালুচরে যাঁহারা বাস-করিতেছিলেন, তাঁহাদের বংশধর কেহ নাই কিন্তু তাঁহাদের দৌহিত্রগণ এখনও ঐ গ্রামে বাস করিতেছেন। উক্ত বংশের শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দেওয়ানজী ও শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত দেওয়ানজী বর্ত্তমান সময়ে উপসী গ্রামে বাস করিতেছেন। রাজবল্লভের ভ্রাতার বংশধর বাবুর বাড়ী দেওয়ানগিরী করেন বলিয়া লোকে উহাদিগকে দেওয়ানজী বলিয়া থাকে।

সর্দ্দার রামরাজা চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরগণ মধ্যে কেহ কেহ ফতেজঙ্গ-পুর গ্রামে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার দুই সহোদরের সন্তানগণ উত্তরপার নগরভাগ গ্রামে বাস করিতেছেন। ফতেজঙ্গপুরে যাঁহারা আছেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, সর্দ্দার যতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুন্সীগঞ্জ বার লাইব্রেরীতে কেরাণীগিরি এবং সর্দ্দার বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কুমিল্লা জজকোর্টের ওকালতি করিতেছেন। রাজারামের ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশধরগণ নাগরভাগের হাওলাদার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সপ্তম অধ্যায়।

১১৭—১২২ পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ ঠাকুর—শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিক্রমপুরে বা পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, প্রেমানন্দ-বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থেও জগন্নাথ ঠাকুরের বিষয় সামান্যতঃ উল্লিখিত আছে। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' প্রণেতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

শ্রীশ্রীনাথ আচার্য্য আর উদ্ধব দাস
জিতামিশ্র কাটকাটার জগন্নাথ দাস।

এই কাটকাটা গ্রাম ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে ইহা কাঠাদিয়া গ্রাম নামে সুপরিচিত। ঠাকুর জগন্নাথ আচার্য্য কাঠাদিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত তথায়ই বাস করেন। গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকার মতে দেখা যায় শ্রীসুচিত্রার দ্বিতীয় সখী শ্রীতিলকিনীর অবতার ঠাকুর জগন্নাথ আচার্য্য গোস্বামী। যথা :—

রসালিকার নাম হৈল শ্রীমান পণ্ডিত।
তিলকিনী জগন্নাথ আচার্য্য নিশ্চিত॥

বিক্রমপুর—সেন রাজবংশীয়গণের প্রখ্যাত নামা রাজধানী। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহারাজ লক্ষ্মণ সেন পিতৃ সিংহাসন অধিকার করেন। লক্ষ্মণ সেনের প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য। হলায়ুধ ও কাষ্ঠকাঠার অধিবাসী ছিলেন। হলায়ুধ ভট্টাচার্য্যের বংশে রত্নাকর মিশ্রনামে এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত মিশ্র মহাশয়ের দুই পুত্র। সর্ব্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ। সর্ব্বানন্দের পুত্রই ঠাকুর জগন্নাথ আচার্য্য গোস্বামী।

"ঠাকুর জগন্নাথ অল্প বয়সেই মাতৃহীন হইয়া পিতৃব্যের অধীনে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। ইনি শিশুকাল হইতে শ্রীবিষ্ণু পরায়ণ ও সদাচার সম্পন্ন। কথিত আছে পিতৃব্য ইহার সহজ সুলভ সদাচারাদি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে বলিতেন আমার জগন্নাথ দাস প্রকৃতই ৺জগন্নাথের সেবক। ঠাকুর জগন্নাথ বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে পদার্পণ করায় পিতৃব্যের আদেশানুসারে অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ঠাকুর জগন্নাথের অধ্যয়ন ভাল লাগিত না। যাহা কিছু করিতেন কেবল গুরু ও পিতৃব্যের শাসনে। এদিকে গৌরাঙ্গের

বিরহ-দাবাগ্নি ঠাকুর জগন্নাথের চিত্তকাননের এক দেশ দিয়া অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করিল। ঠাকুর জগন্নাথ দাস দগ্ধ হরিণীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিয়া কি জানি কি চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় কৃষ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। আহার বিহার ও অধ্যয়ন কিছুতেই রুচি নাই, কেবল চকিতের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

আর ভদ্রাভদ্র ছোট বড় জন সাধারণের ভবনে যাইয়া তিনি বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন যে তোমরা সকলে আমার প্রভুর ভজনা কর। আমার প্রভু—অখিল নাথ, চিন্তামণি, দীনবন্ধু, তাঁহার দয়া হইলে এই দুস্তর ভব-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ইত্যাদিরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশক বক্তৃতা এরূপ গভীর ভাবে করিতেন যে তৎকালীন প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণও তাহার সহিত-বিরুদ্ধ তর্ক বিতর্ক করিয়া জয়ী হইতে পারিতেন না। কে যেন ঠাকুর জগন্নাথের রসনাগ্রে বসিয়া শাস্ত্র যুক্তি-সঙ্গত অতি সুন্দর ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ বলিয়া দিত। ফলতঃ ঠাকুর জগন্নাথ বিনা অধ্যয়নে ঈদৃশ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছিলেন যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণও তাঁহার সহিত বিচার তর্ক করিয়া পরাভূত হইতেন এবং সাধারণ জনসমাজে তিনি পণ্ডিত জগন্নাথ আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হইতেন আর তৎকালীন বিক্রমপুরস্থ পণ্ডিত সমাজেও দৈবশক্তি সম্পন্ন একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া বহুল সম্মানিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তিনি সর্ব্বদা উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন আর 'হা নাথ! হা চৈতন্য! হা কৃষ্ণ!' বলিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতেন। এই প্রকারে ঠাকুর জগন্নাথ দরিদ্রের হারানিধির ন্যায় প্রভুর অন্বেষণ করিতেন। একদা দয়াময় প্রভু সেবকের প্রতি দয়া করিয়া স্বপ্ন-যোগে দর্শন দানে বলিলেন 'জগন্নাথ! আমি শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

সম্প্রতি সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শান্তিপুরে আছি আর শ্রীবৃষভানুনন্দিনীও (শ্রীরাধা) শ্রীমৎ গদাধর রূপে আমার নিকটেই আছেন তুমি এস আর কেন বিলম্ব কর।'

ঠাকুর জগন্নাথ শয্যা হইতে সহসা উত্থিত হইয়া 'প্রভু দাঁড়াও, প্রভু দাঁড়াও, হা নাথ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে শ্রীপাট শান্তিপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কথিত আছে পিতৃব্য প্রকাশানন্দও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নেহ—পরবশ হইয়া তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের এমনি আশ্চর্য্য লীলা যে শ্রীপাট শান্তিপুর যাওয়া পর্য্যন্ত ঠাকুর জগন্নাথের সহিত প্রকাশানন্দের আর সাক্ষাৎ হইল না। প্রকাশানন্দ যেখানে অতিথি হইতেন সেইখানেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিতেন যে ঠাকুর জগন্নাথও গত রজনী কি তৎপূর্ব্ব রজনীতে সেই গৃহেই অতিথি হইয়াছিলেন এবং 'হা নবদ্বীপনাথ! হা ব্রজনাথ! হা প্রাণনাথ! বলিয়া রোদন করতঃ অনাহারে সমস্ত রজনী কৃর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্ম-মূহুর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। এই প্রকারে ঠাকুর জগন্নাথ শ্রীপাট শান্তিপুরে যাইয়া শ্রীমৎ মহাপ্রভুর অনুমত্যানুসারে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিতা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অবতার শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর চরণ আশ্রয় করতঃ তাহার নিকট দীক্ষিত হইলেন। পরদিন প্রকাশানন্দও যাইয়া শ্রীপাট শান্তিপুর উপস্থিত হইলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রকাশানন্দ কিছু কাল শ্রীপাট শান্তিপুর থাকিয়া এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সঙ্গী বৈষ্ণবগণের আচার ব্যবহার দর্শনে এবং উচ্চৈস্বরে তাল লয় সংযুক্ত ভক্তি-সুধা মিশ্রিত অতি মধুর হইতেও সুমধুর হরিসংকীর্ত্তন শ্রবণে বিমোহিত হইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

অদ্বৈত প্রভু দেখিলেন প্রকাশানন্দ প্রভুর ব্রজপরিকর নহেন, কেবল বৈষ্ণব-সংসর্গে হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। সে যাহা হউক শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের একাক্ষর মন্ত্রের দ্বারায় দীক্ষিত করিলেন। কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা অগ্রে ধাবতি ধাবতি। এই বচনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিতেই যেন প্রকাশানন্দ মন্ত্রের ল'কারের স্থানে রেফ শ্রবণ করেন। সুতরাং প্রকাশানন্দের দীক্ষিত মন্ত্র-শক্তির একাক্ষর মন্ত্র হইয়া পড়িল! ঐ মন্ত্রের দ্বারা গঙ্গাতীরে পুরশ্চয়নাদি করিয়া মন্ত্র চৈতন্য করিতে লাগিলেন। এদিকে ধ্যানে প্রবর্ত্ত হইলে প্রকাশানন্দের হৃদয়-দর্পণে শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে শ্রীশ্যামাসুন্দরীর মূর্ত্তি (শক্তি) প্রতিফলিত হইতে লাগিল। আর যতই মন্ত্র জপাদি করিতে লাগিলেন ততই শ্রীমহামায়া ভগবতীর প্রতি আশক্তি জন্মিতে লাগিল। প্রকাশ্যে বৈষ্ণববৎ আচার ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। একদা শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুর নিকট মনোগত সমুদয় ভাব প্রকাশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া মন্ত্রের বিষয় বিশেষরূপে প্রভুকে অবগত করাইলেন। প্রভু ক্ষণকাল থাকিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ বলিলেন যে, তুমি এই মন্ত্রে বহু জন্ম হইতে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছ, ইহাই তোমার জন্মজন্মান্তরীণ মন্ত্র, অতএব তুমি ইহারই উপাসনা করিতে থাক। ইহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। এই প্রকারে কিছুকাল অতীত হইলে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও প্রভুর আদেশ অনুসারে ঠাকুর জগন্নাথ পিতৃব্য প্রকাশানন্দের সহিত স্বদেশে আসিয়া দার-পরিগ্রহ করিয়া কাটকাটা (কাটাদিয়া) গ্রামে বাস করিতে থাকেন। পরে উক্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী আরিয়ল গ্রামে নবাব সরকার হইতে এক জায়গীর তালুক পাইয়া বাস্তবাড়ী করিয়া বাস করিতে থাকেন। তদবধি প্রকাশানন্দের বংশধরেরা শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুর সন্তানগনের নিকটেই শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন এবং

শাক্তাচারই সম্পূর্ণভাবে করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীপাট শান্তিপুরের গোঁসাইদের বাটীর শ্রীযুক্ত প্রভু কুঞ্জবিহারী গোস্বামী কথিত প্রকাশানন্দের সান্তানদিগকে পূর্ব্বরীত্যানুসারে শক্তি মন্ত্র প্রদান করিতেছেন। এদিকে ঠাকুর জগন্নাথের সন্তান-গণেরাও বহুবিধ শাখায় বিভক্ত হইয়া আরিয়ল, কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম) ও পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। তাহার একটী মাত্র গুরুপ্রণালিকা মন্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি তাহা এই ;—

"শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু পাদাণাং"।
শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্নাথ আচার্য্য গোস্বামী পাদাণাং॥
শ্রীশ্রীরাম নরসিংহ গোস্বামী পাদাণাং।
শ্রীরামগোপাল গোস্বামী পাদাণাং॥
শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী পাদাণাং।
শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদাণাং॥
শ্রীমুক্তারাম গোস্বামী পাদাণাং।
শ্রীগোপীনাথ গোস্বামী পাদাণাং॥
শ্রীগোলকচন্দ্র গোস্বামী পাদাণাং।
শ্রীহরিমোহন গোস্বামী পাদাণাং॥

শ্রীগোপালরাজ গোস্বামী—শ্রীরাখালরাজ গোস্বামী। এখন কথা হইতেছে যে কাষ্ঠগ্রাম বা কাঠ কাটাই যে বর্ত্তমান কাটাদিয়া গ্রাম তাহার প্রমাণ কি? অনেকে হয়ত কাষ্ঠগ্রাম বা কাঠকাটার সহিত কাটাদিয়া নামের অনৈক্য দেখিয়া কাষ্ঠকাটা বা কাষ্ঠগ্রামও কাঠাদিয়া গ্রাম যে একই সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত নামের রূপান্তর হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে চাহিবেন না। সর্ব্বাগ্রে তাহা হওয়াই সম্ভবপর। কিন্তু এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরিমোহন শিরোমণির বিবৃত বিবরণী এবং পঞ্চানন বাবুর লিখিত অভিমত যে সত্য তাহা গ্রাম্য বৃদ্ধগণের ও

প্রাচীন দলিলাদির বর্ণিত ও লিখিত মত হইতেও সপ্রমাণ হয়। এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আমি কাঠাদিয়া গ্রামবাসী শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এ, বি এল, মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম তিনি তদুত্তরে আমাকে জানাইয়াছেন যে "কাটাদিয়ার পূর্ব্ব নাম যে কাষ্ঠগ্রাম" ছিল প্রাচীনেরা সকলেই তাহা জানেন। কালী পাড়া গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে যখন আমাদের বাড়ী কাঠাদিয়ায় স্থানান্তরিত হয় তখনও এই গ্রামটি কাষ্ঠগ্রাম নামে পরিচিত ছিল। কাঠকাটা, কাষ্ঠগ্রাম এবং কাঠাদিয়া একই নামের রূপান্তর মাত্র। ঢাকা জেলার মানচিত্রে আমাদের গ্রামের নাম কালাদিয়া লিখিত হইয়াছে, ইংরাজি মানচিত্র দেখিয়াই গ্রামের নাম Kaladia, 'T' এর টানটি পড়ে নাই, তাহাতেই বাংলাতে উঠিয়াছে কালাদিয়া। এইরূপে নাম সহজে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। এ সকল প্রমাণ হইতে সুস্পষ্ট সপ্রমাণ হয় যে কাষ্ঠগ্রাম, কাঠকাটা ও কাঠাদিয়া একই গ্রাম।

আমরা এ অধ্যায়ে যে সকল প্রাচীন সামাজিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, সে সমুদয় প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ হইতে সংকলিত। বাহুল্য ভয়ে মূল অংশ সমূহ উদ্ধৃত করা গেল না।

ফতেজঙ্গপুর ও নগর।

মূলগ্রন্থ—৬১ পৃষ্ঠা।

কেদাররায়কে পরাজিত করার পর নিদর্শন স্বরূপ মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক এই স্থানের নাম ফতেজঙ্গপুর হয়। অধুনা এইস্থান দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত। ফতেজঙ্গপুরের সংলগ্ন গ্রামটি নগর নামে

পরিচিত। এই স্থানের পূর্ব্বনাম শ্রীনগর এই থানেই মোগল সেনাপতি কিলমক্ অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীন কাগজাদি দৃষ্টে জানা যায়, ফতেজঙ্গপুর হইতে দামাদ সাহেব নামক জনৈক মুসলমান সেনানায়ক রূপ-লাবণ্যবতী দিগম্বরী নাম্নী হিন্দু বালিকাকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে ফতেজঙ্গপুরে তৎকালে মুসলমান ভূপতিগণের একটী সেনা নিবাস ছিল।

ইতিহাসে-প্রসিদ্ধ 'কাচকীর দরজা রায়রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া লেদামের নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই রাস্তা সোজাসুজি ভাবে না যাইয়া বক্রভাবাপন্ন হইয়া নগর ফতেজঙ্গপুরের পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। কালীগঙ্গা নদীর একটী শাখা নদী তীরে এই স্থান অবস্থিত ছিল। ঐ নদী কালীগঙ্গা বা ফতেজঙ্গপুরের বাইদ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।'

ঢাকার ইতিহাস—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত।

বঙ্গদেশে পাঠান প্রভাব।

AFGHANS IN BENGAL.

(Inayatulla's Takmilla i Akbar nama.)

Elliot Vol. VI, Page 106.

"Usman an Afgan trod in the path of rebellion, and crossing the Brahmaputra river, was in vain opposed by Baz Bahadur, the Imperial thanador, who retired to Bhawal. Raja Mansing no sooner heard of Baz Baha-

dur's retreat, than, marching the whole night, he joined him on the following morning, and attacking the enemy put him to flight, and took many guns and much spoil. The Rajah having then again delivered the country to Baz Bahadur returned to Dacca, but as the officer of the district now formed the idea of crossing the river and seizing upon the country of Isa, and **Saripur** and **Bakrampur,** the Afgans again assumed a pasture of defiance, and defended the approaches both with guns and boats As the contest continued for sometime, the Raja sent a chosen body in advance, with order to cross the river when they could get the opportunity. But the Afgans opened a discharge of artillery upon them from their boats, and many of the armies were killed. The Raja now opportunely arrived in person, and with his men boldly crossing the river on elephants, the enemy, astonished at their daring took to flight, the Raja drew not his rein till he had followed him to Tira and Mahwari. Than Ghazni, the chief of the latter place, submitted, and the Raja pushed on. **He took Bakrampur and Saripur, and stationed trusty forces throughout the country.** The Afgans then retreated to Sunarganw, while the Raja returned victorious to Dacca.

বুরুজবাড়ী।

বুরুজবাড়ী—রাজাবাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম বুরুজবাড়ী নামে পরিচিত। বুরুজ অর্থে বারুদ। কিংবদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় পূর্ব্বে এস্থানে রায় রাজগণের অস্ত্রাগার এবং গোলা বারুদ ইত্যাদি থাকিত। অদ্যাপিও তথায় প্রাচীন পরিখা বেষ্টিত দুই একটী বাড়ীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বুরুজ প্রাদেশিক অর্থে দুর্গ বা স্তম্ভও বুঝায়। বারুদ পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণতঃ বারুজ অর্থে ব্যবহার হয়। এজন্যই বুরুজ-বাড়ী বলিতে বারুদাগার বা অস্ত্রাগার ইত্যাদি বুঝাইতেছে।

নির্ঘণ্ট।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

মৎ প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রকাশিত হইবার পর অনেকেই আমাকে বারভূঁইয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বঙ্গজকায়স্থ-কুল-গৌরব কেদাররায়ের একখানা বিস্তৃত জীবনী-গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন। সাহিত্যপরিষদের সভাপতি স্বনাম-প্রসিদ্ধ বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল ও বঙ্গের অমর নাট্যকার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই মহাত্মাদ্বয়ের আদেশ এবং উপদেশ ও আমার পরম উৎসাহের কারণ হইয়াছিল। গিরিশ বাবু কেদাররায়ের বিষয় অবলম্বন করিয়া একখানা বৃহৎ নাটক প্রণয়ন করিতে কৃত-সংকল্প হইয়া এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় হইতে বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাকেও স্থানীয় কিংবদন্তী ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছিল। ইহা যে বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে কতদূর গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

'আমাদের ইতিহাস নাই' এ দুর্নাম ঘুচাইবার জন্য বর্ত্তমান যুগে বহু কৃতীপুরুষ সাহিত্য-ক্ষেত্রে মহারথীর ন্যায় অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু এতবড় বাঙ্গালা দেশের পক্ষে তাঁহারা কত মুষ্টিমেয়! দু'একটী সমিতি, পরিষদ বা সাহিত্য-সমাজ দ্বারা বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস শীঘ্র উদ্ধার হওয়া অসম্ভব! তারপর যাহারা ঐতিহাসিকতথ্যানুসন্ধানে বা প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে প্রবৃত্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 'অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,' দাসত্ব করিয়া জীবন যাপন করেন। ঐতিহাসিক তথ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইলে যেরূপ একাগ্র সাধনা, অধ্যয়ন, গবেষণা ও শারীরিক

এবং মানসিক শ্রমের প্রয়োজন—দশদিকে মন-নিবেশ করিয়া তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারেনা। উদরান্নের চিন্তায় দিবা-রাত্রি বিব্রত থাকিয়া সামান্য অবসরে কোনও দুরুহ কার্য্য নিষ্পন্ন করা সম্ভবপর নহে। সাহিত্যের উৎসাহদাতা সাহিত্যসেবীর আশ্রয়স্থল দু'এক জন রাজা মহারাজা বা জমিদার ব্যতীত বাঙ্গালা দেশে আর বড় একটা দেখা যায় না। কাজেই আমাদের ন্যায় অন্নচিন্তা-বিব্রত পল্লব-গ্রাহী সাহিত্যসেবীর পক্ষে কোনও গভীর গবেষণা মূলক গ্রন্থ রচনার চেষ্টা দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কাজেই বারভুঁইয়ার শ্রেষ্ঠতম বীর কেদাররায়ের জীবনী যেরূপ হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই।

নানাদিক দিয়া নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিতে গেলে কেদাররায়কেই বারভুঁইয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনও বাধার কারণ থাকেনা। কেদাররায় কুলীন ছিলেন না, সেজন্য দেশীয় ইতিহাসের মূল উপাদান কুলজী গ্রন্থে তাহাদের দুইভাইর কাহারো নামোল্লেখ নাই। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সর্ব্বাগ্রে ডুজারিক, পার্কাস, পিমেণ্টা প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকগণের গ্রন্থ হইতে কেদাররায় সম্পর্কিত নূতন তথ্য সমূহ আবিষ্কার করিয়া শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রণীত 'প্রতাপাদিত্য' গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ সহ সংযুক্ত করিয়া দেন, এজন্য বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট চির-ঋণী থাকিবে। তাঁহাদের জন্মভূমি বিক্রমপুরে বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি কিংবদন্তী ব্যতাত আর কিছুই জানা যায় না। শুধু কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস রচনা চলেনা। সেজন্যই এতাদিন পর্য্যন্ত কেদাররায় সম্পর্কে ইতিহাসের হিসাবে কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। ঐরূপ গ্রন্থ রচনার ইহাই প্রথম প্রয়াস। ঐতিহাসিক ডাক্তার ওয়াইজ সর্ব্ব প্রথমে চাঁদরায় কেদাররায় সম্পর্কে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে ১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তৎপর বাঙ্গালাসাহিত্যে

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই রায় রাজগণ সম্পর্কে প্রবন্ধ ও নাটক ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় তদীয় 'বিশ্বকোষ' নামক বিখ্যাত অভিধানে চাঁদরায় কেদাররায় সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য লেখকগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় ব্যতীত অপর কেহই কেদাররায় সম্পর্কে কোনরূপ অনুসন্ধিৎসার কিংবা কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কারের পরিচয় দেন নাই। কৈলাস বাবু—তাঁহার কল্পনা প্রসূত বাক্যাবলীর দ্বারা সত্য গোপনের যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা গ্রন্থ মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। তিনি ঐতিহাসিক তাই তাঁহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়াছি হরিসাধন বাবু এবং অনাথ বাবু নাট্যকার তাঁহারা নিজ নিজ কল্পনা-প্রভাবে যে যেরূপ পারিয়াছেন সাজাইয়াছেন—তবে একটা প্রধান কথার প্রতি তাঁহারা কেহই যে লক্ষ্য করেন নাই ইহাই আক্ষেপের বিষয়। ঐতিহাসিক নাটক প্রণয়ন করিতে হইলেও ইতিহাসকে উপেক্ষা করা কোনরূপেই সঙ্গত নহে। কল্পনা-লতা মূল ইতিহাস তরুকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিলেই সুন্দর ও শোভন হয়।

এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে অনেকেই নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে ফেণীর মুন্সেফ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ঘোষ বি, এল (উকীল ভাঙ্গা) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, হেড্‌মাষ্টার বিক্রমপুর বেলতলি হাইস্কুল, প্রিয়তম সুহৃদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, স্নেহাস্পদ শ্রীমান কুমুদনাথ ভট্টাচার্য্য, 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত গুহ এম, এ প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। ময়মনসিংহের

অন্যতম ব্যারিষ্টার বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ দাস এম, এ, বি, এল মহোদয় ফরাসী ভাষায় লিখিত ডুজারিক ও পিমেণ্টার গ্রন্থ হইতে কেদাররায় সম্পর্কিত অংশ সমূহের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন এজন্য তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিলাম।

বাঙ্গালী মাত্রেরই কেদার রায়ের ইতিহাস বিস্তারিত রূপ জানা প্রয়োজন এবং এ সম্বন্ধে যত গ্রন্থ প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী বীরপুরুষ মোগল রাজ-শক্তি,পাঠান-রাজশক্তি ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের বিরুদ্ধে যেরূপ সাহস ও বীর্য্যবত্তার সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছিলেন, স্থলযুদ্ধ ও নৌ-যুদ্ধ উভয় প্রকার যুদ্ধে যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা, সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান দ্বারা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সে সমুদয়ই গ্রন্থ মধ্যে যত্নের সহিত সন্নিবেশ করিয়াছি কিংবদন্তী সমূহও উপেক্ষা করি নাই, কারণ যে দেশে ইতিহাস নাই সে দেশে ঐ সমুদয় উপেক্ষা করিলে ইতিহাস রচনার কার্য্য অগ্রসর হইতে পারে না।

বিক্রমপুরের অনেক দে বংশীয় নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থ আপনাদিগকে চাঁদ কেদার রায়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য উৎসুক, কিন্তু তাহারা কেহই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের কোন কথা জানেন না বা তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণোপযোগী নিদর্শন উপস্থিত করিতে পারেন না, কাজেই কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে কেদার রায়ের বংশধর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমি নানাবিধ অনুসন্ধান দ্বারা যে যে বংশকে প্রকৃত রায় রাজগণের বংশধর বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করিয়াছি গ্রন্থ মধ্যে কেবল তাহাদের বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছি। 'কীর্ত্তি-কথা' অধ্যায়ের অধিকাংশ 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' হইতে গৃহীত।

কেদাররায় বঙ্গজকায়স্থ-কুল-গৌরব। আশাকরি প্রত্যেক কায়স্থ সন্তান তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বীরত্ব-খ্যাতি পাঠে গৌরবানুভব করিবেন। গ্রন্থমধ্যে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবে, কোনও গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বিশেষ ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাহা দূর করা সম্ভবপরও নহে। দেশের ইতিহাস যাহারা ভালবাসেন, দেশকে যাহারা শ্রদ্ধা করেন আমার বিশ্বাস তাহারা সকলেই এ গ্রন্থখানাকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করিবেন। কেদার রায় সম্পর্কে যিনি যাহা জানেন তাহা আমাকে উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগের সহিত লিখিয়া পাঠাইলে ভবিষ্যত-সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশ করিয়া দিব।

কেদার রায় পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা গেল।

মহেন্দ্র-কুটীর মুন্সীবাড়ী
মূলচর, ঢাকা।
২১শে কার্ত্তিক ১৩২০।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বদি বদে দবস্ম
তটযন্ত্রালয়